Vol. 8 | No. 1 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধুমালতী উপাখ্যান

Volume	8
Issue	1
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	June 15, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i1.2
Pages	22-66
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মধুমালতী উপাখ্যান

সৈয়দ আলী আহ্সান

এ পর্যন্ত যতটা সংবাদ পাওয়া যায় তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে, মধুমালতী কাব্যের প্রথম এবং প্রধান রচয়িতা মনঝন। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুক্ল এবং বিশ্বনাথ প্রসাদ মিশ্র মনঝনকেই একমাত্র মধুমালতী কাহিনীর উদ্‌গাতা বলেছেন।[১] মধুমালতী কাব্যে মনঝনের জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। রচনার প্রারম্ভেই আত্মোল্লেখসূচক কতকগুলো চরণ আছে। দশম থেকে ত্রয়োদশ স্তবকের মধ্যে সেলিম শাহ্ শুরের প্রশংসা করা হয়েছে; চতুর্দশ থেকে একবিংশ স্তবকের মধ্যে গুরু শেখ মুহম্মদ গৌসের গুণকীর্তন করা হয়েছে; দ্বাবিংশ এবং ত্রয়োবিংশ স্তবকের মধ্যে খিজির খাঁর গুণকীর্তন; আটত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে কবির আপন নিবাসস্থান চুনারের বর্ণনা করেছেন এবং ঊনচল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ স্তবকের মধ্যে মধুমালতীর রচনাকালের উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

সেলিম শাহের রাজত্বকালে কবি মধুমালতী রচনা আরম্ভ করেন; সেলিম শাহ্ শেরশাহ্ শুরের পুত্র। ৯৫২ হিজরী অর্থাৎ ইংরেজী ১৫৪৫ সালে শেরশাহের দেশান্তরের পর সেলিম শাহ্ শাসক হন। সে বছরই মনঝন মধুমালতী আরম্ভ করেন। সেলিম শাহের গুণকীর্তন করতে যেয়ে মনঝন বলেছেন যে, সেলিম শাহের ব্যক্তিত্ব এত অসাধারণ ছিল যে উত্তরে হেমগিরি থেকে দক্ষিণে সেতুবন্ধ পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিলো।[৩] এটা অবশ্য অত্যুক্তি।

শেখ মুহম্মদ গৌস মনঝনের গুরু ছিলেন। মনঝন তাঁকে 'বড়ে শেখ' বলে উল্লেখ করেছেন। শেখ গৌস একজন সাধুমাত্র ছিলেন না, তিনি তাঁর যুগে একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিও ছিলেন। সম্রাট বাবরও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি অনেকদিন পর্যন্ত অজ্ঞাতবাসে ছিলেন এবং শেরশাহের

দেহাবসানের পর ৯৫২ হিজরীতে তিনি অজ্ঞাতবাস ত্যাগ করেন। মনঝন সে কথার উল্লেখ করে বলছেন :

"সন নৌ সৌ বাবন জব ভএ।
সতী পুরুষ কলি পরিহরি গএ।।
তব হম জিয় উপজী অভিলাখা।
কথা এক বাঁধউঁ রস ভাখা।।"[৪]

৯৭০ হিজরীতে শেখ মুহম্মদের মৃত্যু হয়।

খিজির খাঁ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মনঝন লিখেছেন যে, ইনি সেলিম শাহ শুরের দক্ষিণ বাহু ছিলেন — "দাহিনি ভুজা সাহি কৈ ভারী।"[৫]

মধুমালতীতে কবি নিজের বাসভূমির নামোল্লেখ করেছেন — "সঢ় অনুপ বসি নগরি চর্ণাটী।"[৬] ডঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত বলেছেন যে এই চর্ণাটী হচ্ছে চরণার্দির অপভ্রংশ এবং বর্তমানে চুনার নামে প্রসিদ্ধ।[৭]

মধুমালতীর এ পর্যন্ত কেবল ৪টি পুঁথি পাওয়া গেছে। প্রথম পুঁথিটি রামপুরের নবাবের পুস্তকালয়ের। পুঁথিটি সুরক্ষিত, কিন্তু প্রারম্ভের একটি পত্র নেই। দ্বিতীয় পুঁথিটি ভারত কলাভবন, বারানসীর। পুঁথিটির আদি মধ্য এবং অন্তে খণ্ডিত। এই দুটো পুঁথি ফার্সী হরফে লেখা। তৃতীয় পুঁথিটিও ভারত কলাভবনের। লিপিকর মাধোদাস এবং লিপি দেবনাগরী। চতুর্থ পুঁথিটি একডলা জিলা ফতেপুরের। বর্তমানে ভারত কলাভবনে রক্ষিত। ১৯৬১ সালে এই ৪টি পুঁথি সম্পূর্ণ পরীক্ষা করে ডঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন।[৮]

আমি মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সংস্করণের উপর নির্ভর করেই বর্তমান আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

মনঝন তাঁর রচনার প্রারম্ভে আল্লার গুণগান, রসূল ও চার খলিফার প্রশংসা, সেলিম শাহ্ এবং পীর ও আশ্রয়দাতার গুণগান[৯] করে বচনের প্রশংসা

করেছেন, বাঙ্‌লায় আমরা যাকে বলি বাণী-বন্দনা। কবি বলছেন যে বচনের উৎপত্তি মরণশীল মানুষ থেকে নয়। যদি মানুষ থেকে এর উৎপত্তি হতো, তবে বচন কখনো অমর হ'তে পারতো না ঃ

"বচন কের উৎপতি মুঁহ সেউ।
মানুস বৌল অম্বর দহূঁ কেউ ॥
রহৈ ন বচন কের পতি জহাঁ।
কৈসেঁ বচন অম্বর হোই তহাঁ ॥
দেখহু মনহি বিচারি কৈ বচন বচন হিয় মাঁহ।
বচন ঐস বৈ তাকর জো বর্তত সঙ মাঁহ ॥[১০]

অর্থাৎ 'যদি বচনের উৎপত্তি মুখ থেকে হয়ে থাকে, তবে মানুষের কথা অমর কি করে হলো? যখন বচনের স্বামী (মানুষ) বর্তমান থাকেনা তখন বচন কি করে অমর হয়? মনের মধ্যে বিচার করে দেখো বচনের বচন হৃদয়ের মধ্যে এবং সেই বচন তাঁরই আছে যিনি সর্বসময় বর্তমান থাকেন।'

মনঝন বলছেন যে, আদি সৃষ্টির পূর্বে বচন ছিলো হরিমুখ-মিশ্রিত আদি ওঙ্কার। পরে তা সমস্ত সংসারে ব্যাপ্ত হয়। বচনের দ্বারাই বিশ্বপ্রভু অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছেন ঃ

"প্রথমহি আদি সিষ্টিহু কে পারা।
হরিমুখ বচন লীন্হ ঔ তারা ॥
একৈ বচন আদি ওঙ্কারা।
ভল মন্দ হোই ব্যাপা সয়ংসারা ॥
বিধনৈ জগত বচন বড় কীন্হা।
বচনহুঁতে পসু মানুস চীন্হা ॥
বচন কৈ রাত জান সব হোঈ।
বচন হুতেঁ পরগট ভা সোঈ ॥
কাহুঁ সরূপ ন দেখা ঔ কাহুঁ ন জানেউ ঠাই।
বচনহুঁতে ভা পরগট ত্রিভুবন নাথ গোসাই ॥[১১]

অর্থাৎ 'প্রথমে আদি সৃষ্টির পরে হরিমুখ থেকে বচন অবতীর্ণ হলো। প্রথমে বচনে আদি ওঙ্কার ছিলো, পরে তা ভালো এবং মন্দ হয়ে সংসারে ব্যাপ্ত হলো। বিধাতা বচনকে পৃথিবীতে মহৎ করেছেন। কেননা বচনের দ্বারাই মানুষ এবং পশুকে চেনা যায়। বচনের কথা সকলেই জানে, বচনের দ্বারাই সবকিছু ব্যক্ত হয়েছে। কেউ তার রূপ দেখেনি, কেউ তার আভাস জানেনা। ত্রিভুবন-নাথ স্বামী বচনের দ্বারাই ব্যক্ত হয়েছেন।'

এভাবে মনঝন বচনকে দিব্য অবতার বলে মেনেছেন। তাই তিনি অত্যন্ত যত্নে শ্রদ্ধায় এবং আনন্দে বচন ব্যবহার করেছেন।

বচন বা ভাষা সম্পর্কে এই সতর্কতা মনঝনের কাব্যকে অতিভাষণ থেকে মুক্ত করেছে। তার কাব্যে অনাবশ্যক বিস্তার নেই, বিষয়ান্তরে অনুপ্রবেশ নেই। যদি কখনো বিষয়ান্তর উপস্থিত হয়েছে, অল্পক্ষণ পরেই কবি সতর্ক হয়ে মূল বিষয়ে ফিরে এসেছেন। উদাহরণস্বরূপ মনোহর এবং মধুমালতী প্রথম সাক্ষাৎকারের পর যখন নিদ্রাগ্রস্ত হয় তখন কবি নিদ্রার গুণ অপগুণ ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যখনই তাঁর স্মরণ হয় এটা বিষয়ান্তর, তখন অনুশোচনা করে পূর্ব বিষয়ে ফিরে আসেন ঃ

"হরি হরি কাহাঁ গএউ কাহাঁ রহেউঁ।
কা কিছু কহৈ লিএ কা কহেউ ।।"১২

অর্থাৎ 'হরি হরি, আমি কোথায় ছিলাম এবং কোথায় গিয়ে পোঁচেছি? কোন একটা কিছু বলতে যেয়ে আমি অন্য কি বলা আরম্ভ করলাম?'

কবি অনবরত পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচবার চেষ্টা করেছেন। কোনো বর্ণনা তিনি একাধিকবার করেননি। জায়সীর কাব্যে পুনরাবৃত্তি আছে, কিন্তু মনঝন অশেষ দক্ষতার সঙ্গে পুনরাবৃত্তি পরিহার করেছেন। নখ-শিখ বা নারীর রূপ বর্ণনা বিস্তৃতভাবে একবার মাত্র এসেছে; যখন কুমার মনোহর প্রথম মধুমালতীকে দেখলো। তেমনি উভয়ের মিলন বর্ণনার সুযোগ একাধিকবার থাকা সত্ত্বেও কবি একবার মাত্র ব্যক্তির সঙ্গে সে বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত বর্ণনার মধ্যে

আশ্চর্য সম্ভ্রম, সঙ্কোচ এবং শালীনতা আছে। বর্ণনায় এ সংযমের কারণ সম্পর্কে তিনি বলছেন যে তিনি সংযত হয়েছেন "গুরুজন লাজ মনহি মন মানেউ।" যখন তিনি প্রসুপ্ত নায়িকার রূপ বর্ণনা করেছেন তখন সেখানে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি তার কারণ স্বরূপ বলছেন :

"সোবত বরনি জিঅহি পছিতানেউ।
কস ন জগাই সিংসার বখানেউ ॥
অর জগাই রসবাত কহাঈ।
অরু রস বচন সুনত রসপায়ী ॥"[১৩]

অর্থাৎ সেই কুমারীর প্রসুপ্ত অবস্থা বর্ণনা করে আমি অনুশোচনা করছি কেন তার জাগ্রত অবস্থার রূপ বর্ণনা করলাম না। এখন থেকে জাগিয়ে তার রসবার্তা শোনাবো এবং রসবচন শুনে সকলে তৃপ্ত হবে।'

জায়সীর কাছে প্রসুপ্ত বিষয় যতোটা গুরুত্বপূর্ণ, বিষয়ান্তরও ততোটাই। তাঁর পদ্মাবতে বিষয়ান্তর অনেক রয়েছে। কখনো কখনো কোনো কোনো স্তবকের শ্লেষের সূত্র অবলম্বন করে তিনি ভিন্ন এবং অসম্বদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। নায়িকার নখ-শিখ দুবার বর্ণনা করেছেন, একবার রত্নসেনের সামনে, দ্বিতীয়বার আলাউদ্দীনের সামনে। নায়িকার অঙ্গবর্ণনা তাঁর কাব্যে সঙ্কোচহীন এবং বিস্তারিত। তাঁর বর্ণনায় ফুল, ফল, বৃক্ষলতা, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, অলঙ্কার আহার্য বার বার এসেছে।

মনঝনের মধুমালতীকে মহাকাব্য বলা চলে না। মহাকাব্যের বিস্তার, গুরুত্ব এবং গম্ভীরতা এখানে নেই। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কথাকার ছিলেন। তিনি মূলতঃ প্রেমিক কবি, প্রেমের তাৎপর্য, ব্যঞ্জনা এবং আনন্দবর্ণনাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

মনঝনের ঔদার্য ছিল অসাধারণ। যে ঔদার্য জায়সীকে মর্যাদাবান করেছে, অবিকল সেই ঔদার্যই মনঝনের রচনায় আমরা পাই। আপন ধর্মের উপর পূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে অন্যধর্মের তাৎপর্যকে এরা উভয়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে

স্মরণ করেছেন এবং কখনো কখনো অন্যধর্মের রূপকের মাধ্যমে আপন তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন। মনঝনের সম্পূর্ণ পুঁথি যখন পুরোপুরি আবিষ্কৃত হয়নি তখন মনঝন হিন্দু ছিলেন কি মুসলমান ছিলেন, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারতো। তার কারণ প্রথমাংশের আল্লার বন্দনা, রসুলের গুণগান এবং চার খলিফার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন অপরিজ্ঞাত রাখলে কাহিনীটির অন্য অংশে ইস্লামের পরিচয় প্রধানতঃ পাওয়া যায় না। আরম্ভের বন্দনা অংশ বাদ দিলে একমাত্র ৪২৬ স্তবকে আল্লাহ্ এবং রসুলের কথা আছে ঃ

"প্রথমহি সবরেঁা নাঁউ গোসাঈঁ,
যো ভরি পূরি রহা সভ ঠাঁঈ ॥
দূজে লেঁউ নাঁউ তেহি কেরা।
উতরব পার লাগি জেহি বেরা ॥

অর্থাৎ 'সর্বপ্রথম স্মরণ করছি গোস্বামীর নাম অর্থাৎ আল্লার নাম যিনি সর্ব অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। অনন্তর তাঁর নাম নিচ্ছি (অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের), যাঁর সাহায্যে ভব সাগর উত্তীর্ণ হবো।'— এখানকার বিচার ধারা ইসলামের। কিন্তু এ ছাড়া গ্রন্থের অন্যত্র এমন কোনো সঙ্কেত পাওয়া যায় না যার দ্বারা প্রমাণ করা চলে যে মনঝন মুসলমান। তিনি সর্বত্র হিন্দু পুরাণ থেকে উপমা রূপক সংগ্রহ করেছেন, ব্রহ্মা হরি এঁদের কথা সর্বত্রই ছড়ানো আছে। যেমন ঃ

(১) " হম তুম্হ্ সাচ বজা বহ কীজৈ।
রূদ্র ব্রহ্মা হরি অন্তর দীজৈ ॥"[১৪]

(২) "বচা কীহ্ন বিধি অন্তর রাখী।
রূদ্র ব্রহ্ম হরি কইঁ দৈ সাখী ॥"[১৫]

(৩) "আদিহি সপত জো হম তুম্হ কীএউ।
রূদ্র ব্রহ্ম হরি অন্তর দীএউ ॥"[১৬]

অর্থাৎ (১) 'আমি এবং তুমি সত্য হয়ে বাঁচবো এবং রূদ্র ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে সাক্ষী রাখবো।' (২) 'বিধাতাকে অন্তরে রেখে বচন পেয়েছি এবং রূদ্র ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে সাক্ষী রেখেছি।' (৩) 'আদিতেই আমি এই শপথ তোমার সঙ্গে করেছিলাম এবং রূদ্র ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুকে মধ্যে রেখেছিলাম।'

তবে যাই হোক তিনি যে মুসলমান ছিলেন তাতে বর্তমানে আর কোনো সন্দেহ নেই। তার স্পষ্ট প্রমাণ হলো :

(১) রচনার আদিতে ঈশ্বর বন্দনার পর হযরত মুহম্মদের বন্দনা করেছেন এবং তারপর চার খলিফাকে স্মরণ করেছেন।

(২) রাজার গুণগান করার পর তিনি তাঁর সুফী গুরু শেখ মুহম্মদের কথা বলেছেন।

(৩) ৪২৬ স্তবকে উল্লিখিত বিচার পদ্ধতি হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

মনঝনের প্রধান উপজীব্য হচ্ছে প্রেম; তাঁর জীবনদর্শন প্রেমমূলক। তিনি প্রেমকে অমূল্য বস্তু বলে জ্ঞান করেছেন, তাঁর ধারণায় প্রেমের জন্যই সংসারের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রেমকে অবলম্বন করেই সংসারের রূপ বিকশিত হয়েছে। সে জন্যই এ পৃথিবীতে প্রেমের সমতুল্য আর কিছুই নেই। প্রেমের নির্ভরতা এ পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই পেয়ে থাকে, যে নিজেকে প্রেমের যজ্ঞে আহুতি দেয় সেই একমাত্র বলিষ্ঠ ব্যক্তি। এই প্রেমের হাটে ক্রয়-বিক্রয়ে জড়িত থাকাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান কর্ম। মনঝন বলছেন :

"প্রেম অমোলিক নগ সয়ংসারা।
জেহি জিঅ পেম সো ধনি ঔতারা॥
পেম লাগি সংসার উপাবা।
পেম গহা বিধি পরগট আবা॥
পেম জোতি সভ সিষ্টি অংজোরা।
দোসর ন পাব পেম কর জোরা॥
বীরুলা কোই জাকে সির ভাগু।
সো পাবৈ য়হ পেম সোহাগু॥
সবদ উঁচ চারিহুঁ জুগ বাজা।
পেম পন্থ সির দেই সো রাজা॥
পেম হাট চহুঁ দিসি হৈ পসরী গৈ বনিজোঁ জে লোই।
লাহা ঔ ফল গাহক জনি ডহকাবৈ হোই॥"[১৭]

অর্থাৎ 'প্রেম সংসারের মধ্যে অমূল্য পদার্থ; যার হৃদয়ে প্রেম আছে তার জন্ম ধন্য। বিধাতা প্রেমের জন্য সংসারকে উৎপন্ন করেছেন এবং প্রেমকে অবলম্বন করে পৃথিবী ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমের জ্যোতিঃ থেকে সৃষ্টি উজ্জ্বল করেছেন। এজন্যই প্রেমের সমতুল্য বস্তু সংসারে আর নেই। সে ভাগ্যবান যে প্রেমের সৌভাগ্য পেয়েছে। এই চারি যুগে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে একথা উচ্চারিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রেমের পথে জীবন উৎসর্গ করে সে পায় রাজসম্মান। প্রেমের হাট চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। যার ইচ্ছে হয় সে সেখানে বাণিজ্য করতে পারে। কেউ বাণিজ্যে লাভবান হবে, কারো বা ক্ষতি হবে।'

প্রেম সম্পর্কে মনঝনের বক্তব্য আরো কিছু উদ্ধৃত করা চলে। ৩০ স্তবকে তিনি বলছেন: "যার চিত্তে প্রেমের রেখা পড়েছে সে অদৃশ্যকে দেখতে পায় এবং যদি তার হৃদয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন সে যেদিকেই দেখে সেদিকেই তার আপন আত্মাকেই দেখে। সে যখন জ্ঞানবৃক্ষের ফল পায় তখন সে সর্বস্ব দেয়, সে আর অন্য কিছু কামনা করে না। তখন তার জন্য দৃষ্টির কোথাও দ্বন্দ্ব থাকে না এবং যেদিকেই সে দৃষ্টিপাত করে সেদিকেই আদি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়।"[১৮]

ডঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত বলছেন যে, মনঝনের মতো এতো স্পষ্ট ভাবে এবং এতো পূর্ণতার সঙ্গে প্রেম-দর্শন আর কোনো কবি বর্ণনা করেন নি।[১৯] কথা-নায়ক মনোহরের সঙ্গে কথা-নায়িকা মধুমালতীর প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় অনেক বিস্তৃতভাবে প্রেমের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মধুমালতীর প্রশ্নের উত্তরে মনোহর বলছে: "হে প্রিয়তম, তোমার এবং আমার মধ্যে প্রীতি বহু পূর্বেই বিধাতা সৃষ্টি করেছিলেন। যখন আমরা উভয়ে পৃথিবীতে জীবনলাভ করেছিলাম, আমি আমার জীবন দিয়ে তোমার দুঃখ ক্রয় করেছিলাম। আমি আজই যে তোমার দুঃখে দুঃখিত হচ্ছি তা নয়, জন্মের আরম্ভ থেকেই আমি তোমার দুঃখের সঙ্গে পরিচিত। যেদিন বিধাতা আমার শরীরের সূক্ষ্মরূপ নির্মাণ করলেন, সেই দিনই আমি তোমার দুঃখকে দেখেছি। হে শ্রেষ্ঠ কামিনী,

তোমার প্রীতিতে নিষিক্ত হয়ে যে মৃত্তিকার শরীর গড়ে উঠলো, সে শরীর আমার।"[২০]

মনঝনের বক্তব্য হচ্ছে যখন আদি শরীরে প্রাণ আসেনি তখন প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ-দুঃখ দর্শন করেছে। সেজন্যই আপন প্রাণের চাইতেও প্রিয়তমের কাছে এই বিরহ-দুঃখ অধিক মূল্যবান। প্রেমিকের জন্য বিরহ-দুঃখের একটি ক্ষণ অশেষ আনন্দবান।

তিনি আরো বলছেন যে, সত্যিকারের প্রেমের রহস্য এই যে প্রেমিক এবং প্রেমিকা আদিতে একে অন্যের সঙ্গে ছিলেন একথা যেমন সত্য, তারা বস্তুতঃ একই সত্তা ছিলেন একথা অধিকতর সত্য। তাদের একক সত্তা ক্রমান্বয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। যেমন একই জলে নিষিক্ত করে দুটি মৃৎ-মূর্ত্তি নির্মাণ করা হয় অথবা একই জল দুটি প্রণালীতে প্রবাহমান হয় অথবা একটি দীপক দুটি কক্ষে আলোক দেয় অথবা একই প্রাণ দুটি শরীরে সঞ্চারিত হয় অথবা একই অগ্নি দুই স্থানে প্রজ্জ্বলিত হয় অথবা একই ভবনের দুটি দ্বার।

মনঝন আরো বলছেন. যখন প্রেমিক এবং প্রেমিকার সাক্ষাৎকার ঘটে তখন একে অন্যের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি পরিব্যাপ্ত দেখে। তখন প্রেমিকার রূপ প্রেমিকের কাছে রূপমাত্র থাকে না, তা হয়ে পড়ে পরমরূপের কেন্দ্রবিন্দু। তখন প্রেমিকার রূপের মাধ্যমে প্রেমিক দিব্যরূপের সাক্ষাৎ পায়, যে দিব্যরূপ হচ্ছে শক্তি এবং শিব।

প্রেমতত্ত্বের এতো বিশদ ব্যাখ্যা এবং আনন্দময় উপলব্ধি মনঝন ব্যতিরেকে অন্য কোনো হিন্দী কবির মধ্যে এতোটা দেখা যায় না। প্রধানতঃ তিনজন হিন্দী কবির মধ্যে প্রেমের বেদনা, সৌভাগ্য এবং আনন্দ অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন কুতবন,[২১] মনঝন এবং জায়সী।[২২] কুতবন ছিলেন শেখ বুরহানের শিষ্য এবং শের শাহের পিতা হোসেন শাহের আশ্রিত। ইনি 'মৃগাবতী' নামে একটি কাহিনীকাব্য রচনা করেছিলেন। কাহিনীটি প্রেমমূলক। চন্দ্রগিরির রাজকুমারের সঙ্গে কাঞ্চননগরের রাজকুমারী

মৃগাবতীর প্রেম-কাহিনী তাঁর কাব্যের উপজীব্য। এই তিনজন কবির মধ্যে প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ঠা, ঔদার্য, বিচ্ছেদ এবং বেদনা মনঝন এবং জায়সীর কাব্যে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। জায়সী এবং মনঝনের মধ্যে মনঝন অধিকতর প্রেমাশ্রয়ী। মনঝনের কাব্যে প্রেমের অধ্যাত্মবাদ প্রবল থাকলেও তিনি প্রেমের শারীরিকতাকে অস্বীকার করেননি। শারীরিক অভিচার তাঁর কাব্যে অনেক অংশেই আছে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন বর্ণনের জন্য জীবনের অভীপ্সা এবং উপভোগ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তা প্রকাশের জন্য শারীরিক অভিচার আসতে বাধ্য। জায়সীর কাব্যে বিবাহের পরেই নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটেছে। বিবাহের পূর্বে দেব মন্দিরে শুধু ক্ষণিকের জন্য দর্শন ঘটেছিলো। মনঝনের কাব্যে মধুমালতী এবং মনোহর নিভৃতে দুবার মিলিত হয়েছে — একবার অপ্সরাদের সাহায্যে আকস্মিকভাবে যখন তারা একে অন্যের সান্নিধ্যে এলো এবং দ্বিতীয়বার যখন সখী পেমা তার চিত্রসাড়ীতে উভয়ের মিলন সম্ভব করলো। প্রেমাভিব্যক্তির সমস্ত কেলি-কৌতুক তারা বিবাহের পূর্বে এই দুটি মিলনক্ষেত্রেই সম্পন্ন করেছিলো। শুধুমাত্র তারা সুরত রস আস্বাদন করেনি, বিবাহের পরে অবশ্য তা অনিভার্যভাব স্বয়ংসিদ্ধ হলো। মনঝন সহজ স্বাভাবিক নরনারীর প্রেমের মধ্যে দেহ অবলম্বনের আবশ্যকতাকে স্বীকার করেছেন।

মনঝন তাঁর কাব্যে কথা-নায়ক এবং নায়িকার জন্য অনবরত মৃত্যু-যন্ত্রণা এনেছেন এবং এ ভাবে অনবরত বঞ্চনা এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রেমের সার্থক অনুশীলন ঘটেছে। প্রাপ্তি ঘটেছে অনেকবার, পর মূহূর্তেই বঞ্চনা এবং অপ্রাপ্তিজনিত হতাশ্বাস। জায়সীর কাব্যে প্রেম সাধনার ভিন্ন পরিচয় পাই। সেখানে নায়ক সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং সংগ্রাম করে অবশেষে প্রার্থিত বস্তুকে পাচ্ছে। মনঝনের কাব্যে অভীপ্সা আছে, বঞ্চনা আছে, দৈবযোগ আছে কিন্তু সাধনা নেই এবং সংগ্রাম নেই। এদিক থেকে বিচার করলে মনঝনের কাব্য সর্বাংশে মানবীয় বোধের প্রতীক, জায়সীর কাব্যে মানবীয়বোধ এবং ধর্মতত্ত্ব সমন্বিত হয়ে একটি আনন্দলোক নির্মাণ করেছে।

এখানে আমি সংক্ষেপে মধুমালতীর উপাখ্যান উপস্থিত করছি।

কনৈগিরি গড় নামে একটি প্রাচীন নগরের রাজা ছিলেন সূর্য্যভান। তাঁর কোনো সন্তান ছিলো না। একদিন এক তপস্বী এলেন রাজদরবারে। রাজা বারো বছর পর্যন্ত তাঁর সেবা করলেন। সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তপস্বী রাজাকে এক পিণ্ড তৈরী করে দিলেন পাটরাণীর আহারের জন্য। রাণীর গর্ভ হলো এবং দশমাস পর তিনি এক রাজকুমারের জন্ম দিলেন। পণ্ডিত এবং জ্যোতিষিগণ রাজকুমারের গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে তার নাম রাখলেন মনোহর। তাঁরা আরো বললেন যে, চৌদ্দ বছর এগারো মাস যখন এর বয়স হবে, তখন সে আপন প্রেমিকাকে দেখবে এবং তার বিরহে বিরাগী হয়ে ঘুরতে থাকবে নানা অঞ্চলে একবছর পর্যন্ত। যাই হোক, ক্রমান্বয়ে রাজকুমার বড় হলো, পঞ্চমবর্ষে তার বিদ্যারম্ভ হলো, বার বছরের মধ্যে সমস্ত বিদ্যায় সে পটু হলো। রাজা বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বার বছর বয়সে কুমারকে রাজতিলক দিলেন।

যখন রাজকুমারের বয়স হলো চৌদ্দ বছর এগারো মাস, তখন এক রাত্রে অনেক রাত্রি পর্যন্ত রাজকুমার একটি নৃত্যগীতের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। অর্ধ-রাত্রির পর আপন কক্ষে এসে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলেন। সেই মুহূর্তে কয়েকজন অপ্সরা শূন্যপথে যাচ্ছিল। তারা রাজকুমারের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলো এবং স্থির করলো যে, তার উপযুক্ত কোনো কন্যা তারা খুঁজে বার করবে। তখন তাদের মনে পড়লো মহারস নগরের বিক্রমরাজ কন্যা মধুমালতীর কথা। তখন তারা উভয়ের রূপের তুলনা করবার জন্য পালঙ্ক সহ রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত করলো মধুমালতীর নিভৃত কক্ষে। মধুমালতীর নিভৃত কক্ষে মনোহর নিদ্রা থেকে জাগলো এবং ঘুমন্ত মধুমালতীকে দেখলো। সুন্দরীকে দেখে তার হৃদয়ে পূর্ব জন্মের প্রীতি উদিত হলো। রাজকুমার মধুমালতীর অঙ্গ-প্রতঙ্গ্যের শোভা নিরীক্ষণ করতে লাগলো সে আপন মনে ভাবলো, সেই ব্যক্তির জন্ম ধন্য হবে, যাকে এই সুন্দরী প্রেম করবে।

সুন্দরী তখন জেগে উঠলো নিদ্রা থেকে। শয্যার সন্নিধ্যে অপরিচিত রাজকুমারকে দেখে তার মনে ভয়ের সঞ্চার হলো; কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে

রাজকুমারের পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। কুমার আপন পরিচয় দিলো এবং কন্যার পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। কুমারীও আপন পরিচয় দিলো। কুমার তখন প্রেমে অভিভূত হয়ে কুমারীর চরণ ধারণ করলো। কুমারী তখন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো যে, রাজকুমারের এভাবে অভিভূত হওয়ার কারণ কি? প্রশ্নের উত্তরে কুমার বললো যে, যেদিন বিধাতা তাকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই সে রাজকুমারীর প্রেমিক এবং সেদিন থেকেই সে বিরহভাব বহন করছে। তার হৃদয়ে বেদনা ছিলো, কেননা সে ছিলো প্রীতিমুগ্ধ। তারা দুজন ছিলো অভিন্ন। কুমার ছিলো শরীর এবং কুমারী ছিলো তার প্রাণ। এতদিন পর্যন্ত সে প্রাণবিহীন জীবন যাপন করছিলো কিন্তু অদ্য রাত্রের এই সাক্ষাৎকারের পর তার শরীরে প্রাণ প্রবেশ করেছে। একথা শুনে কুমারীর মনে পূর্ব-জন্মের স্মরণ এলো। কুমারী স্বীকার করলো যে, এখন আর কেউ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনতে পারবে না। কুমারীর এই প্রেমবার্তা শুনে কুমারের দেহে কামনার চাঞ্চল্য জাগলো। কুমার কামিনীর বক্ষ স্পর্শ করবার জন্য হাত বাড়ালো কিন্তু কুমারী তাকে বাধা দিলো এবং বললো যে, দেহ স্পর্শ করবার পূর্বে রুদ্র, ব্রহ্মা এবং হরিকে সাক্ষী রেখে এ শপথ করতে হবে যে, জন্মজন্মান্তর সে তার প্রেমিক থাকবে। কুমার বললো যে, যখন শরীর এবং প্রাণের আলোক পরস্পর অভিন্ন, তখন শপথের প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু অবশেষে পরস্পর শপথ গ্রহণ করে তারা অঙ্গুরী বিনিময় করলো এবং মিলনের তন্ময়তায় মগ্ন হলো। তারা শয্যা পরিবর্তন করলো। নিদ্রাভিভূত হবার পর অপ্সরাগণ রাজকুমারকে নতুন শয্যার সঙ্গে তুলে নিয়ে তার নিজের কক্ষে রেখে গেলো।

সকালে সখীরা রাজকুমারীকে জাগালো। রাজকুমারী ব্যাকুল বিহ্বল নয়নে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলো। সখীরা আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো তার এ অবস্থার কারণ কি? রাজকুমারী বললো সে স্বপ্নে এক রাজকুমারের সাক্ষাৎ পেয়েছিলো, যে তার হৃদয়ে প্রীতি জাগিয়ে চলে গেছে এবং তার কারণেই রাজকুমারী বিরহে পীড়িত হচ্ছে। সখীরা তখন রাজকুমারীকে প্রবোধ দিলো।

অন্যত্র কুমার যখন জাগলো, সে মধুমালতীকে না পেয়ে বিকল হলো। তার এ দশা দেখে তার ধাত্রী সহজা এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলো। রাজকুমার সবকথা বললো। অধিকন্তু সে প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করলো যে, সে মধুমালতীকে পাবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। রাজা এবং রাণী রাজকুমারের এদশা শুনে বৈদ্য ডাকলেন। কিন্তু বৈদ্য কুমারের শরীরে কোনো ব্যাধি পেলো না। রাজার এক মহামাত্য কুমারের এদশা দেখে ধারণা করলেন যে, কুমার নিশ্চয়ই কারো বিরহে ব্যথিত। তাঁর অনুরোধে রাজকুমার মধুমালতীর ঘটনা বললো। মহামাত্য তাকে উপদেশ দিলেন যে, কোনো নারীর মোহে জীবনকে নষ্ট করা উচিত নয়। তাঁর উপদেশের প্রভাব কুমারের উপর পড়লো না। রাজারাণী এ সংবাদ শুনে ব্যথিত হলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। কুমার তখন অনুমতি চাইলো যে, সে মহারস নগরে গিয়ে মধুমালতীর সন্ধান করবে। রাজারাণী অনেক বললেন যে তাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন। এ অবস্থায় কুমারের দেশে থাকা কর্তব্য। কিন্তু কুমার কারো কথা না শুনে যোগীর বেশ ধারণ করে যাত্রা করলো দূরের পথে।

রাজকুমার সঙ্গী সাথী নিয়ে পথ চললো। চলতে চলতে তারা এলো সমুদ্রতটে। চারমাস জলযান করে সমুদ্র-পথে তারা চললো। তারপর একদিন হঠাৎ তাদের জলযান ভেঙে গেলো। কুমার ব্যতিরেকে সকলেই সমুদ্রপথে প্রাণ হারালো। কুমার কোনো প্রকারে বেঁচে সমুদ্রতটে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলো। সেখান থেকে কুমার নিকটবর্তী এক ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করলো। চলতে চলতে দ্বিতীয় দিন কুমার একস্থানে এসে উপস্থিত হলো, যেখানে একটি চৌখণ্ডী ছিলো। চৌখণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করে সে দেখলো একটি শুভ্র কোমল শয্যায় এক ঘুমন্ত রাজকুমারীকে। এই নির্জন স্থানে রাজকুমারীকে দেখে কুমার আশ্চর্য হলো। রাজকুমারী জেগে উঠে কুমারের পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। আরো জিজ্ঞেস করলো সে কি করে এই নির্জন বনে এলো? কুমারও তাকে একই প্রকার প্রশ্ন করলো। কুমারী বললো যে, সে চিত্তবিশ্রাম নগরের রাজা চিত্রসেনের কন্যা এবং তার নাম

পেমা। একদিন সখীদের সঙ্গে সে যখন আম্রকাননে ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত ছিলো, সে সময় মধুকরের উৎপাতে তারা অত্যন্ত বিব্রত হলো। সখীরা সকলে পালিয়ে গেলো। এ সময় একটি রাক্ষস এসে তাকে নিয়ে এ বনখণ্ডের মধ্যে বন্দী করলো। কুমার তার দুঃখে দুঃখিত হলো। কুমারী জানালো যে রাক্ষসের ফিরে আসতে বিলম্ব আছে। এই অবসরে কুমার তার কাহিনী বলতে পারে। কুমার জানালো যে, সে তার প্রেমিকা মধুমালতীর সন্ধানে চলেছে। আপন পরিচয় দিয়ে কুমার সেই রাত্রির ঘটনা জানালো, যে রাত্রে সে মধুমালতীর উপর অনুরক্ত হয়।

পেমা জানালো যে মধুমালতী তার বাল্যসখী। মধুমালতী যখন শিশু তখন তার মাতা এবং পেমার মাতা পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন এবং মধুমালতীর মাতা সখিত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয়ায় কন্যাকে নিয়ে তিনি সখীগৃহে আসবেন। পেমা বললো যে, যদি কুমার পেমার মাতৃগৃহে যায় এবং সেখানে যেয়ে আত্মপরিচয় দেয়, তবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। কুমার এ কথায় প্রফুল্লিত হলো; কিন্তু বললো যে সে পেমাকে এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারে না। এখন থেকে পেমা তার ভগ্নী। পেমা তাকে অহেতুক বিপদের সম্মুখীন হতে নিষেধ করলো। কিন্তু কুমার বললো যে রাক্ষসকে হত্যা করেই সে স্থান ত্যাগ করবে, তার পূর্বে নয়। যখন রাক্ষসের ফিরবার সময় এলো তখন কুমার ভাবলো যে, তার কাছে তো অস্ত্র নেই, সে কি দিয়ে রাক্ষসকে হত্যা করবে? পেমা তাকে অস্ত্র দিলো।

রাক্ষস এসে পৌঁছলো। কুমারকে দেখে প্রশ্ন করলো যে সে কে এবং সে কেন প্রাণ দিতে এসেছে? কুমার বললো যে, সে তাকে হত্যা করে পেমাকে নিয়ে যাবে। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কুমারের তরবারির আঘাতে রাক্ষসের এক মস্তক এবং দুই ভুজ বিচ্ছিন্ন হলো। রাক্ষস তার মস্তক এবং দুই ভুজ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলো এবং আবার সে ফিরে এলো পূর্বেররূপে। এ যুদ্ধে কারো জয় হলো না, কারো পরাজয়ও ঘটলো না। ইতি মধ্যে রাত্রি

হলো এবং রাক্ষস তার প্রয়োজনীয় কর্মে বাইরে গেলো। পেমা তখন কুমারকে রাক্ষসের পুনরুজ্জীবনের রহস্য বললো। দক্ষিণদিকে একটি উদ্যানের মধ্যে অমৃত বৃক্ষ আছে। সেই অমৃত বৃক্ষ উৎপাটন করলে রাক্ষসের মৃত্যু ঘটবে। একথা শুনে কুমার পেমাকে সঙ্গে নিয়ে অমৃতবৃক্ষ উৎপাটন করলো। সকালে আবার রাক্ষস এলো যুদ্ধের জন্য। রাক্ষস আহত হয়ে অমৃতবৃক্ষের সন্ধানে গেলো, কিন্তু উৎপাটিত বৃক্ষ দেখে নিরাশ হয়ে প্রাণত্যাগ করলো।

তদনন্তর তারা এলো চিত্তবিশ্রাম নগরে। চিত্রসেন সংবাদ পেয়ে উল্লাসের সঙ্গে তাদেরে গ্রহণ করলেন। পেমার উদ্ধারের সংবাদ শুনে চিত্রসেন কুমারকে অনেক সম্মান করলেন। চারদিন পর কুমার যখন মধুমালতীর সন্ধানে যেতে চাইলো, তখন পেমা বললো যে, পরের দিন দ্বিতীয়া। মধুমালতীকে নিয়ে আগামী দিন নিশ্চয়ই তার মাতা আসবেন। মনোহরকে সে চিত্রসাড়ীতে বিশ্রাম নিতে বললো এবং জানালো যে সেখানেই মধুমালতীর সঙ্গে তার মিলন ঘটবে।

দ্বিতীয়ার দিন মধুমালতী এলো এবং পেমার কাছে তার উদ্ধারের কাহিনী শুনলো। প্রসঙ্গক্রমে পেমা রাজকুমার মনোহরের কথা বললো। মধুমালতী স্বীকার করলো যে রাজকুমার তার প্রেমিক। পেমা তখন তাকে নিয়ে চিত্রসাড়ীতে মনোহরের কাছে পৌঁছে দিলো। এক সখী যেয়ে প্রথমে জানালো যে, মধুমালতী এসেছে। মধুমালতীর নাম শুনে মনোহরের শরীরে সাত্ত্বিকভাব জাগলো। কম্প হলো এবং মুখে বচন এলো না, চিত্ত অচৈতন্য হলো এবং নেত্র মুদ্রিত হলো ঃ

"জবহি সখী মধু নউ সুনাবা।
দরসেউ সুন তহি সাত্তিক ভাবা॥
কম্প ভাউ মুখ আউ ন বৈনাঁ।
চিতহিঁ চেত গা ঝাঁপে নৈনাঁ॥"

সাক্ষাতের পর মনোহর মধুমালতীর কাছে আপন বিরহের কথা বললো, মধুমালতীও তাকে আপন বিরহ-বেদনার কথা শুনালো। মনোহর তখন ধুমামলতীর

অধরামৃত পান করতে চাইলো। মধুমালতী বললো যে, যতদিন পর্যন্ত না তাদের ধর্মবিবাহ হয়, ততদিন পর্যন্ত তারা সুরত সুখে বিরত থাকবে। মনোহর স্বীকৃত হলো এবং উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে শুয়ে রইলো।

মধুমালতীর অত্যধিক বিলম্ব দেখে তার মাতা রূপমঞ্জরী চিন্তিত হলেন। তিনি তার সন্ধানে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে চিত্রসাড়ীতে উভয়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখে ক্রুদ্ধা হলেন। পেমাকে তিনি কটূক্তি করলেন। পেমা মধুমালতীর পূর্বরাগের কথা বললো এবং জানালো যে, এদের উভয়ের প্রেম নিষ্কলুষ। রূপমঞ্জরী পেমার কাছে মনোহরের পরিচয় পেলেন। রূপমঞ্জরী দুজনকে একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন এবং সুষুপ্ত মনোহরকে কনৈগিরি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং সুষুপ্তা মধুমালতীকে নিয়ে এলেন আপন গৃহে।

কুমার জেগে উঠে মধুমালতীকে না পেয়ে শিরে করাঘাত করে রোদন করতে লাগলো এবং পুনরায় মধুমালতীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। অন্যদিকে মধুমালতীও জেগে উঠে বিরহে ব্যথিত হয়ে রোদন করতে লাগলো। রূপমঞ্জরী তাকে অনেক প্রকার প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেন এবং বললেন যে এভাবে কুলের কলঙ্ক করা তার উচিত নয়। কিন্তু কিছুতেই মধুমালতী শান্ত হলোনা। তখন রূপমঞ্জরী মধুমালতীর দেহে মন্ত্রপূত পানি ছিটিয়ে দিলো। মন্ত্রের প্রভাবে মধুমালতী পক্ষী হয়ে উড়ে গেলো। রাণী তখন নিজের অন্যায়ের কথা বুঝতে পারলেন এবং হাহাকার করলেন।

পক্ষী হয়ে মধুমালতী উড়ে চললো মনোহরের সন্ধানে। কিছুদূর যেয়ে মনোহরের মতো অন্য এক রাজকুমারকে দেখলো, যে ছিল পৌনেরি গড়ের রাজপুত্র। নাম তারাচাঁদ। পক্ষীরূপী মধুমালতী তারাচাঁদের প্রাসাদ শীর্ষে এসে বসলো। কুমার তারাচাঁদ জাল বিছিয়ে পক্ষীকে ধরলো।

তারাচাঁদ মধুমালতীকে রাখলো সোনার পিঞ্জরায় এবং তার সামনে রাখলো নানা প্রকার আহার্য। কিন্তু তিনদিন গেলো মধুমালতী কিছুই খেলোনা। কারণ

জিজ্ঞেস করার পর মধুমালতী আপন দুঃখের কথা বললো। মধুমালতীর কাহিনী শুনে তারাচাঁদ প্রতিজ্ঞা করলো যে, মহারস নগরে যেয়ে মধুমালতীকে তার মনুষ্যরূপ ফিরিয়ে দেবে এবং তারপর মনোহরের সঙ্গে তার মিলন ঘটাবার জন্য যত্ন করবে। অতঃপর কুমার তারাচাদ পক্ষীরূপী মধুমালতীকে সঙ্গে নিয়ে মহারস নগরের দিকে যাত্রা করলো।

তারা মহারস নগরে এলো। রাজা এবং রাণী সমাচার পেয়ে দৌড়ে এলেন। রাণী মন্ত্র পড়ে মধুমালতীকে আবার নারীরূপ দিলেন। তিনি উদ্ধারকর্তা তারাচাঁদের হাতে মধুমালতীকে সমর্পণ করতে চাইলেন। কুমার তারাচাঁদ বললে যে, মধুমালতীর মিলন একমাত্র মনোহরের সঙ্গে হতে পারে।

রাজারাণী একথা শুনে পেমার কাছে পত্র লিখলেন। সন্দেশবাহককে বললেন যে, যদি মনোহরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে তাকে যেনো সঙ্গে নিয়ে আসে। পত্রবাহক যখন পেমার কাছে উপস্থিত হয়ে রূপমঞ্জরীর সংবাদ ব্যক্ত করছে, সে সময় পেমার এক সখী দৌড়ে এসে সংবাদ দিলো যে, রাজকুমার মনোহর যোগীর বেশ ধারণ করে সেস্থানে উপস্থিত হয়েছে। পেমা তখন রাজকুমারকে আপ্যায়ন করে নিলো এবং তাকে মধুমালতীর সমাচার শুনালো। রূপমঞ্জরীর পত্রের উত্তরে পেমা লিখলো যে, যদি সত্যই মনোহরের সঙ্গে মধুমালতীর বিবাহের ব্যবস্থা তাঁরা করতে চান, তবে তাঁরা যেনো পেমার পিতৃগৃহে উপস্থিত হন। মধুমালতীর কাছেও সেই পত্র দিলো। কুমার মনোহরও এক গুপ্ত পত্র প্রেরণ করলো। সে পত্রে কুমার তার অনন্য প্রেম এবং বিরহের কথা জানালো।

মনোহরের কুশল সমাচার পেয়ে রাজারাণী প্রসন্ন হলেন এবং দিন স্থির করে তাঁরা যাত্রা করলেন। দশদিন পথ চলে তাঁরা সামিয়ানা টাঙালেন নদীর ধারে। এখান থেকে সংবাদ পাঠালেন চিত্রসেন এবং পেমার কাছে। চিত্রসেন এবং পেমা সেখানে এলো। বিবাহের তিথি নির্ধারিত হলো এবং সে তিথি অনুসারে মনোহর এবং মধুমালতীর বিবাহ হলো। বিবাহের পর তারা সুরত শয্যায় মিলিত হলো। বিক্রমরাজ বিবাহ প্রসঙ্গে অনেক উপঢৌকন দিলেন।

দ্বিতীয়দিন মনোহর তারাচাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো এবং ইচ্ছা প্রকাশ করলো যে তারা দুজনে বন্ধুর মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। বিক্রমরাজ এই ইচ্ছা সমর্থন করলেন। মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গে থাকতে লাগলো। একদিন তারাচাঁদ মৃগয়ার অভিলাষ করলো। মৃগয়ান্তর জলস্রোতে স্নানের জন্য নামলো। স্নান সমাপন করে তারাচাঁদ যখন প্রত্যাবর্তনের পথে, তখন সে চিত্রসাড়ীর নিকটে ঝুল-খেলায় রত একটি রমণী দেখলো। ঝুলন্ত অবস্থায় তার অঞ্চল উড়ছিলো। তারাচাঁদ তার দেহ সৌষ্ঠব দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লো। মধুমালতী এবং মনোহর এ সংবাদ শুনে সেখানে এলো এবং তারাচাঁদকে সুস্থির করে রাজমন্দিরে নিয়ে এলো। বৈদ্যগণ তাকে পরীক্ষা করে বললো যে, তার শরীরে কোনো বেদনা নেই। সম্ভবতঃ এর চিত্ত অন্য কোথাও ন্যস্ত। তাই যে বস্তু দেখে তার চিত্তবিভ্রম হয়েছে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটলেই এ সম্পূর্ণভাবে সচেতন হবে। মধুমালতী তারাচাঁদের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলো যে, কে সে, কাকে দেখে তার দেহ চেতনশূন্য হয়েছে? তারাচাঁদ বললো যে তার নাম সে জানে না; সে তাকে এক মুহূর্তের জন্য দেখেছে ঝুলন্ত অবস্থায়। তারাচাঁদ তখন সে রমণীর অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্ণনা করলো। মধুমালতী বললো যে সম্ভবতঃ এ রমণী পেমা।

মনোহরের সঙ্গে মধুমালতী আলোচনা করলো এবং বললো যে, তারাচাঁদের সঙ্গে পেমার বিবাহ স্থির করতে হবে। মনোহর পেমার পিতা চিত্রসেনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব আনলো। প্রস্তাব স্বীকৃত হলো এবং শুভলগ্নে তারাচাঁদের সঙ্গে পেমার বিবাহ হলো। রাত্রিতে দুজনে সুখশয্যায় মিলিত হলো এবং প্রথম সমাগমের আনন্দ অনুভব করলো।

সমস্ত বর্ষা দুই রাজকুমার একসঙ্গে রইলো। তারপর উভয়ে চিত্রসেনের কাছে প্রস্তাব করলো যে তারা আপন আপন দেশে প্রস্থান করবে। চিত্রসেন বিক্রমরাজের কাছে এলেন এবং কুমারদের প্রস্তাব শুনালেন। বিক্রমরাজ স্বীকৃত হলো। দুই রাজকুমারীর মাতা কন্যাদের উপদেশ দিলেন। দুই রাজকুমার আপন আপন প্রিয়তমাকে নিয়ে পথযাত্রা করলো। চার ক্রোশ পর্যন্ত এক সঙ্গে

চলে তারা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলো। মধুমালতী তারাচাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নিলো এবং এভাবে পেমাও মনোহরের কাছ থেকে বিদায় নিলো। রাজকুমারীরাও একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলো।

তাঁরাচাঁদ মানগড়ের পথে এবং মনোহর কনৈগিরির পথে যাত্রা করলো। দুবছর পর মনোহর পৌঁছলো কনৈগিরি। যখন দেশে কুমারের আগমন সংবাদ পৌঁছলো, সমস্ত দেশ আনন্দে উৎফুল্ল হলো। রাজকুমার রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে পিতামাতার চরণ স্পর্শ করলো।

কাহিনীর শেষে মনঝন বলছেন, পৃথিবীতে মানুষ যখন মরে যায়, তখন সে আর অমরত্ব পায় না। কিন্তু প্রেম বিরহে যার মৃত্যু হয় তার মৃত্যু নেই। যে প্রেমের অগ্নিতাপ সহ্য করে সে চিরকাল বেঁচে থাকে। প্রেমের শরণ নিয়ে যার আত্মোপলব্ধি, তার মৃত্যু নেই। প্রেম পথে মৃত্যু অবলম্বন করে যে আবার বেঁচে উঠে তার কাছে আর কখনো মৃত্যু আসে না। মৃত্যুর ফলকে সে পায় অমৃতের মতো—তার কায়া অমর। হে জীব, যদি তোমার চিত্তের মৃত্যু হয়ে থাকে তবে তুমি প্রেমের শরণকে অঙ্গীকার করো। তখন উভয় জগতে তোমার কালভয় নষ্ট হবে। এই জগৎ হচ্ছে প্রেমের শরণশালা। এবং যেখানে অমৃত শোভিত আছে সেখানেই প্রেমের স্থান। যতোদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে কাব্যশরীর থাকবে অর্থাৎ কবিতা থাকবে ততোদিন পর্যন্ত প্রেমের নামও থাকবে ঃ

"অমর ন হোত কোই জব হারৈ।
মরি জো মরৈ তেহি মীঁচু ন মারৈ॥
পেম কৈ আগি সহী জেইঁ আঁচা।
সো জগ জনমি কাল সেউঁ বাঁচা॥
পেম সরনি জেইঁ আপু উবারা।
সো ন ঘরৈ কাহু পর মারা॥
একবার জো মরি জীউ পাবৈ।
কাল বহুরি তেহি নিয়র ন আবৈ॥
মিরিতু ক ফল অঁব্রিত হোই গয়া।
নিহচৈ অমর তাহি গৈ পয়া॥

জো জিউ জানহি কাল ভৌ পেম সরণ করি নেম।
হীটৈ দুহূঁ জগ কাল ভৌ সরণ সাপ জগ পেম ॥
জো অঁব্রিত জহঁ ছাঁজে অসো স্বভর সো ঠাউঁ।
কবিতা গাত জবহি লহি রহৈ জগত মহঁ নাউ ॥"[২৩]

॥ ২ ॥

মধ্যযুগের বাঙ্‌লা কাব্যে মধুমালতীর উপাখ্যান অনুসৃত হয়েছে। অনুসৃত বললাম এইজন্য যে, পদুমাবতের ক্ষেত্রে অনুবাদ যতোটা উজ্জ্বল এবং ব্যাপক, মধুমালতীর ক্ষেত্রে ততোটা নয়। তবে এখানে মনঝনের কাহিনী অনুসরণ করা সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশের. পূর্বে এ সম্পর্কে যে সমস্ত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে তার নিরসনের প্রয়োজন।

বাঙলাতে যে কজন কবি মধুমালতীর উপাখ্যান রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দুজন—মুহম্মদ কবীর এবং সৈয়দ হামজা। ধারণা করা হয় মুহম্মদ কবীর এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম।[২৪] মুঃ কবীরের মধুমালতী উপাখ্যানটি অসম্পূর্ণ এবং অনেক অংশ অশুদ্ধ বাচন ভঙ্গীতে লেখা। সম্ভবতঃ অশুদ্ধ বাচনভঙ্গীর জন্য লিপিকরগণ দায়ী। একটি মাত্র পুঁথি[২৫] অবলম্বন করে যে পাঠটি নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে বিবেচনার অভাব অত্যন্ত বেশী পরিলক্ষিত হয়। কাব্য মধ্যে দুটি ভণিতায় মুহম্মদ কবীর বলেছেন যে, তিনি ফার্সী কিতাবকে বাঙলাতে অনুবাদ করেছেন।[২৬] ফার্সী কিতাব অর্থ ফার্সী ভাষায় লেখা গ্রন্থ, না ফার্সী হরফে লেখা আরবী গ্রন্থ তা বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় মুহম্মদ কবীর ফার্সী হরফে লেখা মনঝনের মধুমালতীকে অনুসরণ করেছিলেন। আমার প্রমাণ আমি একটু পরেই উপস্থিত করছি। প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার যে মনঝন ফার্সী হরফে লিখেছিলেন কি-না।

মনঝনের যে চারটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার মধ্যে দুটি পাণ্ডুলিপি ফার্সী হরফে আর দুটি নাগরী হরফে। কিন্তু নাগরী হরফে লিখিত পাণ্ডুলিপি-

গুলো মূল ফার্সীর প্রতিবর্ণীকরণ মাত্র। নাগরী পাণ্ডুলিপিগুলোর লিপি পরম্পরা পরীক্ষা করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়। আমি নিম্নে কতকগুলো উদাহরণ উপস্থিত করছি।

১। ভারত কলাভবনে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে যে সমস্ত পাঠ বিকৃতি পাওয়া যায়, সেই বিকৃতিগুলো ফার্সী হরফ থেকে নাগরী হরফে রূপান্তরিত হওয়ার দরুণ ঘটেছে।[২৭] যেমন—

(ক) আদর্শ ফার্সী পুঁথিতে 'যের'-এর চিহ্ন না থাকার দরুণ প্রতি-বর্ণীকরণের ক্ষেত্রে শব্দের যে পরিবর্তন ঘটেছে তা লক্ষ্যযোগ্য। যেমন—নিবারৌ > নবাবৌ ; কঠিন > কঠন ; থিগ থিগ > থক থক ইত্যাদি।

(খ) ب কে پ বুঝবার ভুলে | যেমন, বিয়াপিউ > পিআপিউ।

(গ) چ কে ج বুঝবার ভুলে | যেমন— উচাহা > উজাহা।

(ঘ) گ কে ک পড়বার ভুলে | যেমন— থিগ থিগ > থক থক।

(ঙ) ও কে পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বার ভুলে | যেমন—পহিরাএউ > ফিরায়েউ।

(চ) 'পেশ'-এর চিহ্ন না থাকার দরুণ। যেমন— একোকারী > এককারি ; হরিগুণ > হরিগণ।

২। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি একডলা জিলা ফতেহপুরের। বর্তমানে ভারত কলাভবনে রক্ষিত। এই পাণ্ডুলিপিতেও ফার্সী হরফ থেকে প্রতিবর্ণীকরণের জন্য অনেকগুলো বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন—

(ক) ফার্সীতে 'অ'-কারের চিহ্ন না থাকার দরুণ অ-কারান্ত শব্দ প্রতিবর্ণী-করণের সময় ই-কারান্ত অথবা ও-কারান্ত হয়েছে। যেমন—কুঁঅর > কুঁঅরি ; লহ্‌লহা > লুহ্‌লুহা ; আপন > আপনি ; কুমার > কুমারী।

(খ) 'যের'-এর চিহ্ন না থাকার দরুণ। যেমন—অরি > অর ; অসি > অস ; দাসী > দাস ; সিধিনিধি > সিধনিধ ; বিরহ > বরহ ; বলি > বল ; আহি > আহ ইত্যাদি।

(গ) 'পেশ'-এর চিহ্ন না থাকার দরুণ। যেমন—একোকারী>এককারী ;

(ঘ) ب কে پ পড়বার ভুলে। যেমন—বস>পস্থ।

(ঙ) ٹ কে ت পড়বার ভুলে। য়েমন—পরবট>পরবত।

(চ) ڑ কে ر পড়বার ভুলে। যেমন—বড়>বর।

(ছ) ک কে گ পড়বার ভুলে। যেমন—জাকে>জাগে ; খোলে>ঘোলে;

(জ) گ কে ک পড়বার ভুলে। যেমন—অগণিত>একন্ত ; গাঢ়ে>কাঢ়ে।

(ঝ) 'পেশ'-এর উচ্চারণ 'উ'-কে 'ও' বুঝবার ভুলে। যেমন—মুহ>মোহি ; হুতে>হোতে ইত্যাদি।

(ঞ) শব্দান্তের ه কে না পড়বার ফলে। যেমন—নহি>ন।

(ট) ی কে পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বার ভুলে। যেমন—ভোগই>ভোগী ; জিয়>জৈ ; করিয়ৈ>করী ইত্যাদি।

এভাবে প্রমাণ করা চলে যে, জায়সী যেমন ফার্সী হরফে পদুমাবত লিখেছিলে মনঝনও তেমনি মধুমালতী লিখেছিলেন ফার্সী হরফে। পরে এ উভয় কাব্যই দেবনাগরী হরফে প্রতিবর্ণীকৃত হয়। পরবর্তী কালে আবার নাগরী হরফ থেকে ফার্সী হরফে রূপান্তরিত হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন জায়সীর ক্ষেত্রে দেখেছি। তবে এগুলো তুলনায় অনেক আধুনিক এবং বিশ্লেষণে সহজেই তা ধরা পড়ে।

উপরোক্ত কারণে আমার ধারণা হয় যে, মুহম্মদ কবীর ফার্সী কেতাব বলতে ফার্সী হরফে লিপিবদ্ধ কাব্যকেই বুঝেছেন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে, যাতে নিশ্চয় হওয়া যায় যে মনঝনের মধুমালতী অবলম্বন করে তিনি তাঁর মধুমালতী কাহিনী রচনা করেছিলেন। যদিও মুহম্মদ কবীরের কাহিনীটি পরিসর এবং বিস্তারের দিক থেকে প্রায় এক-দশমাংশ তবুও কাহিনীর ক্রমধারা, ঘটনা পারম্পর্য এবং বিশেষ বিশেষ বক্তব্যের জন্য তিনি মনঝনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন।

মুঃ কবীর মনঝনের মধুমালতীর ঘটনার পারম্পর্য যে ভাবে রক্ষা করেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এখানে দেবার চেষ্টা করবো।

ঈশ্বরবন্দনার পর কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। সন্ততিহীন রাজা সূর্যভান এবং তাঁর পাটরাণী কমলাসুন্দরীর পরিচয় দিয়ে অবশেষে কুমার মনোহরের জন্ম, জন্মের পর জ্যোতিষিগণ কর্তৃক তার ভাগ্যগণনা এবং অবশেষে ক্রমান্বয়ে কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ অংশটুকু মনঝন কৃত মধুমালতীর প্রথম স্তবক থেকে ৫৭ স্তবকের ভাব-সংক্ষেপ। তত্ত্বগত কয়েকটি বক্তব্য মূলের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন ঃ

(১) বাঙ্‌লা — আপে ব্যক্ত আপে গোপ্ত আপনে সকল।
অবধী — গুপুত রহৈ পরগট জগ বেরসৈ সরব বিয়াপক সোই।

অর্থাৎ 'সে গুপ্ত থাকে কিন্তু প্রকট হয়ে জগতে বিকশিত হয় এবং সে সর্বব্যাপক।'

(২) বা — এবে অবধান কর রসিক সুজন।
রঙ্গের প্রবন্ধ এক করিব রচন॥
অ — অংব্রিত কথা কহোঁ জব গাঈ।
রসিক কান দৈ সুনহু সোহাঈ॥

অর্থাৎ 'এখন আমি অমৃত কথা গাইবো। হে রসিক সুজন, তোমরা কান দিয়ে শুন।'

(৩) বা — বাপের যে ধর্মকর্ম পুত্রের সে পালন॥
পুত্র না থাকিলে বাপ কুফল জীবন॥
বলবুদ্ধি জ্ঞান ছাড়ি সংসার নৈরাশ।
পুত্র না থাকিলে বাপ সমূলে বিনাশ॥

অ — কলি সন্ততি সেউ দোসরি আউ।
বিন সুত জীবন জনম নসাউ॥
সুত বিনু মুবেঃ নাউঁ কো লেঈ।
সুত বিনু কো কত পিংডহি দেঈ।

অর্থাৎ 'কলিকালে সন্তান হচ্ছে দ্বিতীয় আয়ু এবং পুত্র না থাকলে জীবন এবং জন্ম নষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুর পর মাতাপিতার নাম পুত্র ছাড়া আর কে নেবে এবং কে-ই বা পিণ্ডদান করবে?'

এর পরের ঘটনা হলো কুমার মনোহরের শিক্ষালাভ ও রাজার অভিলাষ এবং তৎপর মনোহরের অভিষেক। এ অংশটুকু মূলের ৫৭ স্তবক থেকে ৬৪ স্তবকের ভাব সংক্ষেপ। তুলনীয় অংশ হচ্ছে ঃ

(১) বা — পড়িয়া যে শাস্ত্র সব জানিল অপার।
বিজয় করিল শাস্ত্র পৃথিবী মাঝার॥

অ — অউর গরন্থ গিয়ান জোগ কে পঢ়ে অনেক কুমার।
নীপুন ভৌ গুণ বিদ্যা বাদি ন কোউ পার॥

অর্থাৎ 'জ্ঞান এবং যোগের অন্য অনেক গ্রন্থ রাজকুমার পড়লো এবং বিদ্যাতে সে অমন নিপুণ যে কেউ তার সমকক্ষতা করতে পারতোনা।'

অভিষেকের রাত্রে নৃত্যগীতের পর কুমার ক্লান্ত হয়ে যখন নিদ্রাভিভূত হলো তখন তার বর্ণনা —

বা — রঙ্গে ঢঙ্গে দুই প্রহর নিদ্রাএ আলস্য বড়
সুতিলেন্ত সুবর্ণ পালঙ্কে।

অ — দেখত নাচ অধর ভৈ রজনী অর সেউ রাজভুবার!

অর্থাৎ 'নাচ দেখতে দেখতে অর্ধরাত্রি হলো এবং রাজকুমারের আলস্য লাগলো।'

পরীকর্তৃক মনোহর মধুমালতীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা যে অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে সে অধ্যায়টি মূলের ৬৫ স্তবক থেকে ৬৭ স্তবকের সংক্ষিপ্ত রূপ। মনোহর ও মধুমালতীর পরিচয় ও প্রণয় অধ্যায়টি মূলের ৭৭—১৩৫ স্তবকের সংক্ষেপ। তুলনীয় কয়েকটি চরণ হলো ঃ

(১) বা — মধুর সুস্বরে তবে অবলা ফুকুরি ॥
কুমারেত পুছে বাণী করি করজুড়ি ॥
শুন শুন যুবরাজ কহ মহাশএ।
তুহ্মি কোন হুও মোত দেও পরিচএ ॥

অ — পুনিবর কামিনী অধর অমলে।
অংব্রিত বচন কহন কইঁ খোলে ॥
পূছি ঁহি মধুরে বচন রসারা ;
কো আহিহু তুহ্ম দেবকুমারা ॥

অর্থাৎ ' পুনরায় সেই বরকামিনী অমৃত বচন বলবার জন্য তার অমূল্য অধর খুললো। সে মধুর এবং রসপূর্ণ বচনে জিজ্ঞেস করলো, 'হে দেবকুমার তুমি কে ?

(২) বা — চক্ষেত ধরএ জুতি তুয়া অঙ্গলীলা।
অ — তোরে রূপ গড়ে দুই লোয়ন নহি দেখোঁ নিসরন্ত।

অর্থাৎ ' তোমার রূপের মধ্যে আমার দুই নয়ন আবদ্ধ হয়েছে, আর তারা বেরিয়ে আসতে পারছেনা।'

(৩) বা — তেকারণে তুহ্মি আহ্মি হৈছি একমেলে।
অ — তু মৈ দুবৈ সদা সংঘবাসী।

অর্থাৎ ' তুমি এবং আমি আমরা সদৈব সঙ্গবাসী।'

(৪) বা — এক দীপে দুই ঘর করিছে উজল।
অ — একই জ্যোতি দুই ভাউ দেখাঈ ॥

অর্থাৎ ' একই জ্যোতি দুইরূপে দৃশ্যমান হচ্ছে।'

পরিগণ কর্তৃক মনোহরের অপসারণ এবং মধুমালতীর বিলাপ এ দু'টি অধ্যায় মূলের ১৩৫—১৪৪ স্তবকের সংক্ষেপ। মনোহরের প্রণয় বেদনা অধ্যায় মূলের ১৪৫—১৭৫ স্তবকের সংক্ষেপ। তুলনীয় চরণগুলো এই :

(১) বা — তোমার বেদনা শুনি কহত আহ্মারে।
বেদনা বুঝিয়া ঔষধ দিবাম তোহ্মারে ॥

অ — আপনি পীর পূত কহু মোহী।
মৈঁ কই দেউঁ সো ঔখদি তোহী ॥

অর্থাৎ ‘ হে পুত্র, তুমি তোমার পীড়ার কথা আমাকে বলো, তাহলে আমি তোমাকে ঔষধি দেবো।’

(২) বা — শিরের মন্দির ফেলে ভূমিতে আছাড়ি।

অ — রায় পাগ সির ভূইঁ দৈ মারী।

অর্থাৎ ‘ রাজা তাঁর মাথার পাগড়ি ভূমিতে আছাড় দিলো।’

মনোহরের অভিযাত্রা, নদীপথে মনোহর, পায়মার সঙ্গে মনোহরের পরিচয়, পায়মার আত্মপরিচয়, এবং পায়মার উদ্যানবিহার এ ক'টি অধ্যায় মূলের ১৭৬—২১৫ স্তবকের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

মনোহরের আত্মকথা অধ্যায়টি ২১৬—২৪০ স্তবকের সংক্ষেপ। তুলনীয় চরণগুলো এই ঃ

(১) বা — এ বুলিয়া যুবরাজ উঠিয়া চলিলা।

অ — এহ গিয়ান গুনি মন মহঁ ঠাড় ভএউ উঠি রাউ।

অর্থাৎ ‘ মনে একথা জ্ঞান করে রাজকুমার উঠে দাঁড়ালো।’

(২) বা — কুমারের পদে যাই আবেশে ধরিল।

অ — নৈন নীর ভরি পেমা ধাই পরী লৈ পাউ।

অর্থাৎ ‘ পেমা চোখে পানি ভরে দৌড়ে যেয়ে তার পদ ধারণ করলো।’

(৩) বা — দুর্মতি দেওর ভএ না রাখ হৃদএ।

অ — রাকস্ ভরম মনহিঁ জনি করহু।

অর্থাৎ ‘রাক্ষসের ভয় হৃদয়ে রেখোনা।’

(৪) বা — যেনমতে দোহানের প্রতিজ্ঞা আছিল।
যেনমতে আপনার রাজ্যেত আইল॥
যেনমতে প্রেম ভাবি উদাস হইল।
যেনমতে সৈন্য সবে পয়াণ করিল॥
যেন মতে সৈন্য সবে নৌকাত চড়িল।
যেনমতে সৈন্য নৌকা স্রোতে গরাসিল॥
যেন মতে এক বৃক্ষে ভাসিতে পাইল।
যেন মতে বনপন্থ হাঁটিয়া আইল॥
যেন মতে কন্যারূপে প্রেমের ভিখারী।
এ সুখ সম্পদ রাজ্য সব পরিহরি॥

অ — প্রথমহিঁ জিমি ভই রৈনি চিহ্নাঈ।
অরু জৈসে পালক বদলাঈ॥
ঔ জিমি বচা আপু মহঁ কীন্হী।
ঔ সহিদানি সুন্দরি কর লীন্হী॥
ঔ জিমি তজেউ পিতা ঘর রাজু।
ঔ নিসরেউ করি যোগী সাজু॥
ঔ বূড়েউ জিমি অরথ ভণ্ডারা।
ঔ সো গহেঁ লৈ লহরি অভারা॥

অর্থাৎ ‘যে প্রকারে রাত্রিকালে প্রথমে তাদের পারস্পরিক পরিচয় হয়েছিলো এবং যে প্রকারে তাদের প্রতিজ্ঞা হলো এবং যে প্রকারে অভিজ্ঞান রূপ অঙ্গুরীয় পরিবর্তন হলো, যে প্রকারে পিতৃগৃহ ছেড়ে যোগীর সাজে বেরিয়ে এলো এবং যে প্রকারে অর্থভাণ্ডার ডুবে গেলো এবং তাকে সমুদ্রের ঢেউ তটপ্রান্তে ফেলে দিলো।’

উপরের বাঙলা এবং অবধী উদ্ধৃতাংশ দুটি পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিশেষকরে অবধীর অনবরত ‘জিমি’ কথাটার পৌনঃপুনিকতা

বাঙ্‌লাতে 'যেন মতে'-র পৌনঃপুনিকতায় দাঁড়িয়েছে। এ অংশটুকুতে মূলের স্পষ্ট প্রভাব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

মালতী সংবাদ অধ্যায়টি মনঝনের ২৪১—২৬৫ স্তবকের ভাব সংক্ষেপ। দৈত্যের সঙ্গে মনোহরের যুদ্ধ অধ্যায়টি ২৬৮—২৭৫ স্তবকের ভাব সংক্ষেপ এবং মনোহর সহ পায়মার স্বদেশ গমন অধ্যায়টি মূলের ২৭৬—৩১৫ স্তবকের ভাবসংক্ষেপ। এ অধ্যায়ের সঙ্গে মূলের তুলনীয় অংশগুলো নিম্নে দেওয়া হচ্ছে ঃ

(১) বা — চলিতে চলিতে পন্থ অগাধ কানন।
চারিমাস পন্থ যেন নিত্য সুশোভন॥
অ — ফুনি উঠি দুবৌ পন্থ সির ভএ।
মাঁস চারি বনহিঁ বন গএ॥

অর্থাৎ 'তদনন্তর দুজনে উঠে পথারূঢ় হলো এবং চার মাস পর্যন্ত অগাধ কাননের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো।'

(২) বা — পুনি বালা বলে শুন রাজার নন্দন।
কুবেশে কুৎসিত আর অতি কুলক্ষণ॥
এমন কুবেশ দেখি হাসিব নরনারী।

অ — সুনহু কুঁবর এক বাত হমারী।
মৈ এহি নগর রাজ ঘরবাড়ী॥
কৈসে এহি ভেস ঘর জাইয়।
কাহে দুরজন লোগ হঁসাইয়॥

অর্থাৎ 'হে কুমার, আমার একটি কথা শুন। আমি এই নগরের রাজার কন্যা। কি করে আমি এ বেশে ঘরে যাবো এবং কেন দুর্জন লোককে হাসবার অবকাশ দেবো?'

(৩) বা — ছত্রসেন রাজা পুছে মধুর বচন।
দেও হস্তে কোন্ মতে উদ্ধার হইলা॥
অ — চিত্রসেনি ফুনি পুছে বারা।
কৈঁই তোহি দিএউ মোঁখ নিস্তারা॥

অর্থাৎ ' চিত্রসেন তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মোক্ষ এবং নিস্তার কে দিল ?'

(৪) বা — আএ বাপ নিবেদহোঁ শুন নরনাথ।
এক রাজপুত্র তবে সংহতি আসিছে॥

অ — পৈমা লাগি পিতা সোঁ কহৈ।
কুঁবর এক মোরে সংঘ অহৈ॥

অর্থাৎ ' পেমা পিতাকে বললো, এক কুমার আমার সঙ্গে আছে।'

(৫) বা — এথ শুনি উজির এক ডাকি নরনাথ।
সেনাপতি পাঠাইলা কুমার যথাত॥

অ — চিত্রসেনি শুনি মন্তি পাঠাবা।
আদর কৈ কুঁবরহি লৈ আবা॥

অর্থাৎ ' চিত্রসেন শুনে মন্ত্রী পাঠালেন এবং আদর করে কুমারকে নিয়ে এলেন।'

মনোহর এবং মালতীর মিলন অধ্যায়টি মূলের ৩১৬ — ৩৫১ স্তবকের ভাব সংক্ষেপ। উভয়ের তুলনীয় চরণগুলো এই ঃ

(১) বা — পূর্ণবিধু সঙ্গে আইলা নব ইন্দুরানী।
মাও সঙ্গে আইল মধুমালত সুন্দরী॥

অ — নিসি বিহানি জব ভোর ভা সুর কীন্হ পরগাস।
আঈ জননি সাথ মধুমালতি চিত্রসেনি কে পাস॥

অর্থাৎ ' যখন রাত শেষ হলো, প্রভাত হলো এবং সূর্য আপনাকে প্রকাশ করলো তখন মার সঙ্গে মধুমালতী চিত্রসেনের কাছে এলো।'

(২) বা — অধরে অধরে জুড়ি প্রেমের সন্ধান।

অ — অধর অধর রস গিয়ত অঘানে।

অর্থাৎ ‘ উভয়ে উভয়ের অধর রস পান করে তৃপ্ত হলো ।’

(৩) বা — চিরদিন দোহোঁ জান হইল একত্তর ।

অ — দেখত সমুঝি ন জিয় পরহিঁ দহুঁ হহিঁ এক কি দোই ।

অর্থাৎ ‘ দেখলে মনে এ জ্ঞান জাগে না যে তারা এক, না দুই ।’

(৪) বা — নির্মল কুলেত মোর কলঙ্ক রাখিল ।
কোপ করি পায়মাক বহুল ভৎর্সিল ॥

অ — দেখত রাহু জৈসি ভই কারী ।
পেমা পাপ আই দঈ গারী ॥

অর্থাৎ ‘ একে দেখে সে রাহুর মতো কৃষ্ণবর্ণ হলো এবং পেমাকে অনেক ভৎর্সনা করলো ।’

(৫) বা — যেন মতে কন্যা সঙ্গে কুমার মিলন ।
যেন মতে প্রতিজ্ঞা আছিল দুইজন ॥
যেন মতে পালঙ্ক অঙ্গুরী পাল্টনা ।
যেন মতে নিদ্রাকালে কৈলা ভিন্ন ভিনা ॥
যেন মতে দোহোঁ ভাবে আকুল প্রভীন ।

অ — উতপতি বাত কহী সভ পেমৈ মিলে দুবৌ জেহি ভাঁতি ।
পালক ফেরি বদলি কর সুন্দরী পহিরেন্হি ভই জিয় সাঁতি॥

অর্থাৎ ‘ পেমা প্রারম্ভের সকল বার্তা শুনালো, যে প্রকারে উভয়ে একত্রিত হয়েছিলো, পালঙ্ক পরিবর্তিত হয়েছিলো এবং করাঙ্গুলির অঙ্গুরীয় পরিবর্তন করে তাদের চিত্ত শান্ত হয়েছিলো ।’

(৬) বা — দোহান নিকটে যাই মঞ্জরী মন্ত্র পড়এ ।
চৈতন্য পাইয়া দোহোঁ মন্ত্র তেজে মোহএ ॥
সে মন্ত্রের মোহে পলে কুমার অবশএ ।
সেই মোহে মালতীরে মঞ্জরী নিল ঘরে ॥
বন মাঝে চৈতন্য পাইলা মহাবীরে ।

অ — অসি মোহনি চখ নিন্দ্রা লাগে।
করবট দীন্‌হ তবহুঁ নহিঁ জাগে ॥
কুঁবরহি লৈ সো কনৈগিরি ডারা।
মধুমালতি লৈ মন্দির উতারা ॥

অর্থাৎ 'চোখে এমন মোহিনী নিদ্রা লাগলো যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সুচক্র ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তারা জাগলো না। কুমারকে নিয়ে কনকগিরিতে ফেলে দিলো এবং মধুমালতীকে আপন ভবনে নিয়ে এলো।'

সারিরূপিনী মালতীর সঙ্গে তারাচাঁদের সাক্ষাৎকার অধ্যায়টি মূলের ৩৫২ — ৩৭৩ স্তবকের ভাবসংক্ষেপ। তুলনীয় অংশগুলো এই :

(১) বা — তা দেখিয়া মহাদেবী মহামন্ত্র জপে ভাবি
মন্ত্র ফুকে কন্যা শির 'পরে।
মন্ত্র তেজে শুক হইল দেখি কন্যা তাপিল
পাখ-ফৈর উড়িবারে হেরে ॥

অ — তব চিরুবা ভর লৈ কৈ পঢ়ি ছিরকেসি।
লাগত খিন মধুমালতী পংছী হোই উড়ানি ॥

অর্থাৎ 'তখন এক পশর পানি নিয়ে মন্ত্র পড়ে মধুমালতীর মুখে ছিটিয়ে দিলো। পানি পড়া মাত্রই সে পক্ষী হয়ে উড়ে চললো।'

(২) বা — কি করিলুঁ এথ না ভাবিয়া।

অ — কহৈ কহা মৈঁ কীন কীন অয়ানী ॥

অর্থাৎ 'বললো, আমি কি মূর্খতা করিলাম।'

(৩) বা — রাজ্য মোর মহারস জিনি আছে বাণীরস
রাএ যে বিক্রম অধিকারী।
সে রাজার আহ্মি সুতা প্রেমভাবে হেন গতা
নাম মোর মালতী সুন্দরী ॥

অ — নগর মহারস বিক্রম রাউ।
পিতা রাজ অতি বল বৌসাউ ॥
মৈঁ তেহি ঘর পুত্রী উতরী।
অচক অবস্থা মোহি সির পরী ॥

অর্থাৎ ‘মহারস নগরের রাজা বিক্রম, তিনি আমার পিতা। তিনি রাজা, বলশালী ও পুরুষার্থ সম্পন্ন। আমি তাঁর গৃহে কন্যারূপে উৎপন্ন হয়েছি এবং হঠাৎ আমার শিরে এ অবস্থা পতিত হয়েছে।’

মালতীকে নিয়ে তারাচাঁদের মহারস গমন অধ্যায়ের তুলনীয় অংশগুলো ঃ

(১) বা — হেন সমে পাইল এক মালিনীর ঘর।
নানা পুষ্পমালা গাঁথে মালিনী সুন্দর॥

অ — পুনি জৌনঁা মালিনি কৈ বারী উতরেউ রাজকুমার।
মালিনি পুহুঁপ পিএঁ ডালিই কীনহেউ আই জোহার॥

অর্থাৎ ‘তারপর জনৈকা মালিনীর বাটিকায় রাজকুমার উপস্থিত হলেন এবং মালিনী ডালি ভরে ফুল নিয়ে তাকে নমস্কার করলো।’

মুহম্মদ কবীরের মধুমালতীর শেষাংশ নেই, গ্রন্থটি তাই অসম্পূর্ণ। তুলনীয় যে অংশগুলো আমি উপরে উপস্থিত করেছি তাতে প্রতিপন্ন হয় যে, মনঝনের মধুমালতী অবলম্বনে মুঃ কবীরের মধুমালতী রচিত হয়েছে। মনঝনের মধুমালতীর রচনা আরম্ভ হয় ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। গ্রন্থ রচনা কবে শেষ হয় তা জানা যায়নি। জায়সী বা তুলসীদাসের কাব্য যতোটা প্রচলিত ছিলো, মনঝনের কাব্য ততোটা প্রচলিত ছিলো না। জায়সীর পদ্মাবৎ উপাখ্যানের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে অর্থাৎ জায়সীর পূর্বে এ কাহিনীর লৌকিক রূপ কি ছিলো এবং ইতিহাসেই বা এ কাহিনীর পরিচয় কতটুকু, তা আমরা জেনেছি।[২৭] কিন্তু মনঝনের কাহিনীর এমন কোনো সূত্র এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। দ্বিতীয় কথা এই, যেখানে মনঝনের সমসাময়িক কবি জায়সীর কাব্যে রাজদরবারের সঙ্গে জড়িত থাকা সূত্রে আলাওল জানতে

পারলেন ১৭শ শতকে, সেখানে একজন সাধারণ কবির পক্ষে মনঝনের কাহিনী সঙ্গে সঙ্গেই জানা অসম্ভব বলে মনে হয়। মুঃ কবীর কোন রাজদরবারের কবি ছিলেন না। তিনি সুফী বা তত্ত্বজ্ঞানী বা পণ্ডিত ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি। বরঞ্চ তার বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। অর্থাৎ মূল রচনার মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্য তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা ও উল্লাস আছে, বাঙলা রচনায় তা অস্বীকৃত এবং অনুপস্থিত। তবে স্পষ্ট প্রমাণের অভাবে স্থির নিশ্চয় হয়ে বলা যায়না যে মুঃ কবীর কখন তাঁর কাব্য রচনা করেন। মধ্যযুগে এক ভাষার কাহিনী অন্য ভাষার জনসমষ্টির কাছে পরিচিত হতে স্বাভাবিকভাবেই সময় নিতো। প্রথমতঃ বাচনভঙ্গীর দুরূহতা, দ্বিতীয়তঃ যানবাহনের অসুবিধা। এই দুই কারণেই প্রধানতঃ অবধী ভাষার কাহিনী বাঙলা ভাষায় গৃহীত এবং রূপান্তরিত করতে স্বাভাবিকভাবেই দেড়শো থেকে দুশো বছর লাগে। তাহলে মুঃ কবীরের মধুমালতীর রচনাকাল হয় ১৭শ শতকের শেষ দশকে, অথবা ১৮শ শতকের আরম্ভে।[৩০]

মনঝনের পর আরো অনেকে ফার্সীতে গদ্যে পদ্যে মধুমালতীর উপাখ্যান অবলম্বন করে কাহিনী রচনা করেছেন।[৩১] কিন্তু সৃষ্টি হিসেবে সেগুলো কোনো স্থায়িত্ব পায়নি। "কিস্‌সা-এ মধুমালত ওয়া কোনোয়ার মনোহর" এই নামে একটি অপ্রচলিত অজ্ঞাতনামা কবির কাব্যকে অবলম্বন করে মুঃ কবীর তাঁর মধুমালতী উপাখ্যান রচনা করেছিলেন এমন ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। কিন্তু তা যথার্থ বলে আমার মনে হয় না। প্রমাণস্বরূপ বাঙলা অনুবাদ সহ ফার্সী উদ্ধৃত এবং তুলনাস্বরূপ মধুমালতীর অংশবিশেষ উপস্থিত করছি।[৩২] দেখা যাবে মধুমালতীর অংশবিশেষ ফার্সীর সঙ্গে আবেগ এবং বক্তব্য প্রকাশের দিক থেকে কোনোক্রমেই মেলেনা। শুধুমাত্র তথ্যগত কিছুটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু তথ্যগত সম্পর্ক দ্বারা অনুবাদ প্রমাণিত হয় না।

"হাকিম ও হাম মুনাজ্জম গাশ্‌ত হাযের
শুদান্দ হার য়ক বরো খুরশিদ খাতের
বদিদন্দ তালে' মাস্‌-উদ বুদশ
বরামদ আখতারে দৌলত যেনুরশ
নেহাদন্দ নামে উ কুঁয়র মনোহর
শাওয়াদ আন্দর যাহাঁ আজ শামসে আযহার

খবর দানন্দ কারেশ রাযে আন্‌জাম
চেহ্‌ আয দৌলত চেহ্‌ আয মিলকাত্‌ চেহ্‌ আয নাম
শাওয়াদ চু পাঁজদহ্‌ সালা মনোহর
খালেশ শখসে বোয়াদ দারসিনাহ্‌ আযহার
শাওদ যোগী বাহার জানে বাগারদদ্‌
কেহ্‌ তা এক সাল বাহার উবাগারদদ্‌
চুবাদ আয সায়ের আয়েদ সোবি খানাহ্‌
বদস্ত আরাদ হামা মতলবে যমানাহ্‌

অর্থাৎ 'হাকিম ও গণৎকারগণ উপস্থিত হইলেন এবং তাঁর সূর্যসদৃশ মুখকান্তি দেখে আনন্দিত হলেন। তাঁরা তাঁর শুভলক্ষণগুলো দেখলেন এবং তাঁরা তাঁর ভাগ্যনক্ষত্র আবিষ্কার করলেন। তাঁরা তাঁর নাম মনোহর রাখলেন। সূর্যের চেয়েও তিনি উজ্জল হবেন। তাঁরা তাঁর জীবনের পরিণাম ও রহস্যের সংবাদ দিলেন — তাঁর ঐশ্বর্য কতোটা হবে তাঁর খ্যাতি কতোটা হবে এবং তাঁর রাজত্ব কি হবে এ সম্পর্কে। যখন তাঁর বয়স ১৫ বছর হবে, তখন কোন এক বিশেষ জনের জন্য তাঁর হৃদয়ে জ্বালা হবে। তিনি যোগী হয়ে সবদিকে বেরিয়ে পড়বেন এবং এক বছর পর্যন্ত বাইরে ঘুরবেন। এই ভ্রমণের শেষে যখন তিনি গৃহে ফিরে আসবেন, তখন পৃথিবীর সমস্ত তাৎপর্য তাঁর হাতের মুঠোয় এসে যাবে।"

মুহম্মদ কবীরের মধুমালতীতে এ অংশের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

ওলিগণে গুনিতে মাগিতে লাগিল।
ভালমন্দ কুমারের সকল গুনিল ॥
রাশিক্রমে পুরাণেত দেখিয়া উপাম।
রাখিলেক মনোহর কুমারের নাম ॥

ভাগ্যবন্ত তোহ্মা পুত্র চন্দ্রের সমান।

মাত্র কি হইব দুঃখ কুমার অন্তর।
এক চন্দ্র-মুখী লাগি হৈব দেশান্তর ॥
পঞ্চদশ বরিষেত এ সকল হৈব।
পুনরপি আসি কুমার রাজত্ব পালিব ॥

তুলনা করলে স্পষ্ট প্রমাণ হবে যে ফার্সীর সঙ্গে বাঙ্‌লার একেবারেই কোনো মিল নেই।

মুহম্মদ কবীরের মধুমালতীতে পাত্র-পাত্রীদের নাম এবং স্থানের নাম মূলের সঙ্গে অসঙ্গত। যেমন—কুঙ্গিরা, পাহেজা, রূপসমঞ্জরী, জটবহর, ছত্রসেন এবং পায়েমা। কমলা, মনোহর, সূর্যভান, মহারস, বিক্রমরাজ, তারাচাঁদ, — এ নামগুলো ঠিক আছে। অসঙ্গত নামগুলো ফার্সী লিপি থেকে উদ্ধারের সময় বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। এটা সহজেই বুঝা যায়। যেমন کنیگر এর ی-এর নোকতা যদি না থাকে এবং তখন কেউ যদি گ কে পূর্ববর্তী বর্ণ ن-এর সঙ্গে সংযুক্ত করে পড়ে তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় 'কঙ্গিরা' বা 'কাঙ্গুরা' বা কাঙ্গির ইত্যাদি। অথবা যেমন پیما-কে 'পায়মা' অথবা 'পৈমা' অথবা 'পেমা' যে কোন ভাবেই কেউ পাঠ করতে পারে। অথবা যেমন چتبسرام। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে ফার্সী লিপির چ দেবনাগরী হরফে 'জ' হয়েছে এবং ت 'ত' না হয়ে 'ট' হয়েছে। আবার শব্দ মধ্যবর্তী ه-এর উপরের বৃত্তাংশ যদি অস্পষ্ট থাকে অথবা মুছে যায় তাহলে তা س হয়ে পড়ে। এ সমস্ত কারণে ফার্সী হরফে লেখা 'চিতবিশ্রাম' বাঙ্‌লাতে 'জটবহর' হতে পারে। শব্দান্তের 'আম'-ধ্বনিটি পরবর্তী শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। রূপসমঞ্জরী ছত্রসেন এবং পাহেজা অশিক্ষিত লিপিকরের বিভ্রান্তি বলে মনে হয়। উচ্চারণের দিক থেকে এ তিনটি শব্দই দোভাষী পুঁথির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মুহম্মদ কবীরের কাব্যে মূলের সঙ্গে ঘটনাগত একটি ব্যতিক্রম আছে। সেটা হলো দৈত্যের জীবন সম্পর্কিত উপাখ্যানটি। মনঝনের কাব্যে আছে যে, অমৃতবৃক্ষ উৎপাটন করার ফলে দৈত্য শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালো। মুঃ কবীরের কাব্যে আছে যে, একটি উদ্যানের মধ্যে একটি সুন্দর কূপ আছে। সেই কূপের মধ্যে আছে এক খড়্গ, যার নাম আলোজ্যোতি। সেই খড়্গ দিয়ে দৈত্যের 'জীবস্তম্ভ' কেটে ফেললো। কাহিনীটি পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলে মনে হয়। বাগানের নাম 'লালবাগ', কূপের মধ্যে খড়্গের স্থিতি যার নাম 'আলোজ্যোতি' — এ ধরণের নাম, উপমা এবং বর্ণনা একমাত্র দোভাষী পুঁথিতেই

পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সৈয়দ হামজা তাঁর 'প্রেমাবতী মনোহর' ৩৩ কাব্যে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ অংশটুকু অত্যন্ত সহজ করেছেন ঃ

এতেক বলিয়া দৈত্য গেল পলাইয়া।
কহিতে লাগিল কন্যা কুমারে ডাকিয়া॥
যুদ্ধে না পারিবে তুমি রাক্ষসের সাথে।
বৃথা কেন প্রাণ দেবে রাক্ষসের হাতে॥
অমৃত ফলের গাছ বাগানেতে আছে।
পাপিষ্ঠ দৈত্যের প্রাণ সেই গাছে আছে॥
চল আনি সেই গাছ করিয়া তল্লাশ।
ফলে মূলে উখাড়িয়া করিব বিনাশ॥

॥ ৩ ॥

অষ্টাদশ শতকে রচিত সৈয়দ হামজার 'প্রেমাবতী মনোহর কাব্য' দোভাষী পুঁথির যুগের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। সৈয়দ হামজার কাহিনীটি সম্পূর্ণ। উপাখ্যানের সমাপ্তি আছে এবং কাহিনীর সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিস্তারও আছে। উপাখ্যানের ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, মনঝনের মধুমালতীর সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। মূলতঃ মনঝনের কাহিনীর ঘটনা পরম্পরা এখানে সম্পূর্ণ অনুসৃত হয়েছে একথা বললে অন্যায় হয় না। সৈয়দ হামজা একজন কথাকার মাত্র। সুতরাং উপভোগ্য কাহিনী নির্মাণের দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিলো, মূলের প্রেমতত্ত্ব এবং হতাশা এবং আশ্বাস ও তৃপ্তিকে তিনি অনুসরণ করেননি। তাই মনঝনের রসনিবেদন সৈয়দ হামজার কাব্যে ফলশ্রুতি পায়নি। কাহিনীর অনুসৃতি কি প্রকারের হয়েছে, একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। দ্বিতীয়বার মনোহরের সঙ্গে মধুমালতীর যখন মিলন হলো, রাজকুমারী পেমার চিত্রসাড়ীতে তখন কন্যাকে অনেকক্ষণ না দেখে রানী রূপমঞ্জরীর ব্যাকুলতা এবং অবশেষে কন্যাকে মনোহরের সঙ্গে এক শয্যায় দেখে তাঁর যে ক্রোধ, তার বর্ণনা সৈয়দ হামজা এভাবে দিয়েছেন ঃ

মালতীরে লইয়া যে[৩৪] কুমার মনোহর।
আনন্দে শুইয়াছিল পালঙ্ক উপর ॥
হেনকালে মহলেতে[৩৫] মালতীর মাতা।
মন্থরা দাসীকে ডাকি জিজ্ঞাসে বারতা ॥
কোথা গেল পেমা সঙ্গে মালতী সুন্দরী।
ত্বরায় ডাকিয়া আন নির্লজ ঝিয়ারি ॥
ক্রোধিত দেখিয়া কহে[৩৬] পেমার জননী।
ক্রোধ না করিহ[৩৭] দিদি মঞ্জরী বহিনী ॥
দাসী পাঠাইয়া দিনু তল্লাসে দোহার।
এইমাত্র আসিয়া দিবেক সমাচার ॥[৩৮]
দোহে মিলি ফুল তোলে ফুলের বাগানে।
এখনি আসিবে তারা তোমা বিদ্যমানে ॥
মঞ্জরী এতেক শুনি হইল অস্থির।
ক্রোধভরে[৩৯] ঘর হইতে হইল বাহির ॥
যেখানে ফুলের বাগে[৪০] মনোহর বায়।
মালতী লইয়া কোলে সুখে নিদ্রা যায় ॥
আচম্বিতে সেইখানে হইল উপনীত।[৪১]
মালতী শুইয়াছে [৪২] দেখে কুমারের সঙ্গ।
আনল সমান জ্বলে[৪৩] মঞ্জরীর অঙ্গ ॥
ক্রোধভরে[৪৪] পেমারে কহিছে কটু বাণী।
অবিবাহী কন্যা তুয়া[৪৫] হইলি দ্বিচারিণী ॥
কোথা হইতে নাগর[৪৬] লৈয়া আইলি সাথে।
অকুঁয়ারী কন্যা মোর [৪৭] মজাইলি তাতে ॥

মনঝনে এই অংশের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

'সূর্য অস্তমিত হলো এবং শশী প্রকাশিত হলো ; এক শয্যায় তারা উভয়ে শয়ন করলো ....এদিকে রূপমঞ্জরীর মনে চিন্তা উপস্থিত হলো — চিত্ত ব্যাকুল হলো, মনে ভ্রম উৎপন্ন হলো এবং হৃদয়ে সন্দেহ জাগলো। তখন তিনি মধুরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

> 'রাজকুমারী ঘর ছেড়ে চিত্রসাড়ীতে কেন? মধুরা উত্তরে বল্লেন 'আমি তার কাছে দাসী পাঠাচ্ছি। সে এখনি এসে খবর দেবে। তুমি ব্যস্ত হয়োনা। তারা দুজন বাল্য সখী। পিতৃ গৃহে আনন্দে রসকেলি করে নিক। অনেকদিন পরে তারা মিলিত হয়েছে। সেজন্যই তাদের বিলম্ব হচ্ছে।' রূপমঞ্জরী তাঁর নিষেধ না শুনে চিত্রসাড়িতে যেয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে সমস্ত চিহ্ন দেখলেন। যখন রূপমঞ্জরী চিত্রসাড়ীতে এলেন তখন তিনি দেখলেন যে শশিমণ্ডলের মধ্যে সূর্যকিরণ আত্মগোপন করেছে এবং সূর্যকে দেখে শশীর জ্যোতিঃ লুপ্ত হয়েছে। দেখে তিনি রাহুর মতো কৃষ্ণবর্ণ হলেন এবং পেমাকে ভৎসনা করলেন, 'তুই নির্লজ্জা এবং তুই আমার মর্যাদার হানি ঘটিয়েছিস। তুই আমার কুলে কলঙ্ক লাগিয়েছিস।'[৪৮]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সৈয়দ হামজা কাহিনীর ঘটনা পরম্পরাকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মূল বাচনভঙ্গীর অনুবাদ করেন নি। বরঞ্চ মূলে প্রেমের রসাস্বাদের যে বিবরণ ছিলো, বাঙলাতে তা গৃহগত সৌজন্য, নিষ্ঠা এবং আচারের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে তথ্যবিন্যাস একই প্রকৃতির — মধুমালতীকে নিয়ে মনোহরের আনন্দবিশ্রাম, কন্যার আগমনের বিলম্ব দেখে রূপমঞ্জরীর উৎকণ্ঠা, পেমার মাতা কর্তৃক উৎকণ্ঠা দূরীকরণের চেষ্টা, মধুমালতীর কক্ষে রূপমঞ্জরীর আগমন এবং ক্রোধবশতঃ পেমাকে ভৎসনা। কিন্তু মনঝন কৌতূহল, আনন্দ, উৎকণ্ঠা, যন্ত্রণা এবং বিচ্ছেদের যে পরিচয় তাঁর বর্ণনার মধ্যে এনেছেন বাঙলাতে তা রূপান্তরিত হয়নি। তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যে ক্ষেত্রে মনঝনের উদ্দেশ্য ছিলো প্রেমের সৌরভ এবং সৌন্দর্যকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে জাগ্রত করা, সেক্ষেত্রে সৈয়দ হামজার উদ্দেশ্য ছিলো শুধুমাত্র একটি কৌতুক ও প্রেম-সৌভাগ্যের গল্প বলা।

আমি এরপর অন্য একটি অধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মালতীকে যেখানে বিবাহের জন্য সুসজ্জিত করা হচ্ছে, বাঙলা কবিতায় সে অংশটুকু বর্ণনার মহার্ঘতায় উজ্জ্বল। মহামূল্য বস্ত্র অলঙ্কারের দীপ্তি এবং দেহ-সৌষ্ঠবের লাবণ্য এই বর্ণনার

উপজীব্য। মনঝনের কাব্যে এ বর্ণনা নেই। সেখানে চিত্তদাহ, আকাঙ্ক্ষা, মিলনের সম্ভাবনা এবং অবশেষে সম্ভোগ-সৌভাগ্যে জীবনের পরিপূর্ণতার কথা আছে। সৈয়দ হামজার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

বসাইয়া[৪৯] মনোহরে বিক্রম আদেশ করে
আপনার দাসীরে ডাকিয়া।
রজনী হৈল শেষ তুরিত করিয়া বেশ
মালতীরে আন সাজাইয়া॥

শুনিয়া রাজার বাণী যেখানে মঞ্জরী রাণী
দাসী গিয়া[৫০] কহে সমাচার।
আজ্ঞা কৈল মহারাজ কর মালতীর সাজ
ক্ষেণ হৈল মঙ্গল বিভার॥

শুনিয়া দাসীর মুখে মঞ্জরী পরম সুখে
নবীন যুবতীগণে নিয়া।
মালতী কন্যার তরে সুবর্ণ পিঁড়ির 'পরে
স্নান করাইল বসাইয়া॥

নানা হাস্য পরিহাসে মালতীর আশে পাশে
রূপসী গায়েন গীত[৫১] গায়।
যুবগণ কৌতূহলি কেহ দেয় করতালি
কেহ কেহ খঞ্জনি বাজায়॥

লৈয়া সুবর্ণ ঝারি আনন্দে কৌতুক করি
কেহ কেহ দেয় জলধারা।
নারীগণ আনন্দেতে সরুয়া গামছা হাতে[৫২]
বদন মাঞ্জন করে[৫৩] তারা॥

সিনানিয়া[৫৪] মালতীরে দ্বিতীয় পিঁড়ির' পরে
বসাইয়া[৫৫] মুছিল বদন।
দুই চারি সখী মিলি বাহুভরে ধরি তুলি[৫৬]
কেহ তার বদলে বসন॥

কোলে করি লৈয়া গিয়া ডুলিচায় বসাইয়া
নারীগণ বসিল বেড়িয়া।
তুরিত মঞ্জরী রাণী বস্ত্র অলঙ্কার আনি
জোগাইল মালতী লাগিয়া ॥

সহজে রূপের ভারে আপনি চলিতে নারে
নবীন যৌবন তাহে ভার।
রূপের মুরারি বালি ক্ষীণমধ্যা[৫৭] পড়ে হেলি
কেমনে বহিবে অলঙ্কার ॥

চন্দ্রের জিনিয়া রূপ সূর্যের জিনিয়া ধূপ
আভরণ কিবা প্রয়োজন।
আরতির চিহ্ন যত[৫৮] দেশের চলন মত
আনিল কিঞ্চিৎ আভরণ ॥

রূপে রসে অপরূপ বর্ণচ্ছটায় এ অংশটি সৈয়দ হামজার নিজস্ব সৃষ্টি। মনঝনের কাব্যে বিবাহস্তুতির বর্ণনা নিম্নরূপ:

"মধুরা সকল রাণীকে সুসজ্জিত করলেন এবং তাঁরা কুমার মনোহরের বিবাহ দিতে চললেন। পেমা তার সখীদের নিয়ে চললো। তারা সকলেই ছিল এক বয়সী। কেউ ছিলো সুখাসনের উপর বসে, আবার কেউ ছিলো চৌদোলায়। কেউ ছিলো সংযুক্তা আবার কেউ ছিলো অজ্ঞাত যৌবনা। তাদের যৌবন ছিলো উন্নমিত। তারা খেলা করে চলছিলো যেনো সচকিত বনবল্লরী। এ সমস্ত বালিকা ছিলো কমলমুখী এবং নবতনু এবং তাদের নেত্রে কটাক্ষ ছিলো। গোধূলি লগ্নে বরযাত্রীরা এলো রাজদ্বারে। বিবাহ মণ্ডপে কুমারকে বসালো মধ্যে এবং মধুমালতী দাঁড়ালো তার বাঁয়ে। বিদ্বান ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করছিলেন এবং চৌরাশী আহুতি দিয়ে হোম করছিলেন। ব্রজবালারা স্বস্তি পাঠ করছিলো এবং বর-বধূর আঁচলে গিঁঠ দিচ্ছিলো। কুমারী কুমারের কণ্ঠে হার দিলো এবং কুমার হার পরালো মধুমালতীর গ্রীবায়।"[৫৯]

দেখা যাচ্ছে বর্ণনা দুটি সমান্তরাল নয়। এভাবে উভয় কাব্যের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পাবো যে মুল কাহিনীর উপাখ্যানগত কাঠামো বাঙলাতে অবলম্বিত হয়েছে, কিন্তু মূলের ভাষা, বর্ণনা এবং আবেগ অনুদিত হয়নি। মুহম্মদ কবীরের ক্ষেত্রে অনুবাদের আভাস বিক্ষিপ্তভাবে অনেক অংশেই পাওয়া যায়, কিন্তু সৈয়দ হামজার কাব্যে তা অনুপস্থিত। মধ্য যুগের রোমান্টিক কাব্যের অবাস্তবতা এবং রহস্যকে স্বীকার করেও সৈয়দ হামজার মধুমালতী বাঙালীর সংস্কার, আচারনিষ্ঠা, রীতিনীতি, গৃহগত সৌজন্য, কৌতুক এবং আনন্দ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। মুহম্মদ কবীরের কাব্যের তুলনায় সৈয়দ হামজার কাব্য অনেক বেশী সমৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত এবং আনন্দময়।

তথ্য-নির্দেশ

১. রামচন্দ্র শুক্ল: হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস (ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ, সংবত ১৯৯০), পৃ: ৯৬—১০১।
বিশ্বনাথ প্রসাদ মিশ্র: হিন্দী সাহিত্য কা অতীত (বাণী-বিতান প্রকাশন, বারানসী, সংবত ২০১৫), পৃ: ১৭৩।

২. মনঝন কৃত মধুমালতী: সম্পাদক, মাতাপ্রসাদ গুপ্ত (মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ইলাহাবাদ, ১৯৬১)।

৩. উত্তর হেমগিরি লহি পরবানা।
দক্ষিণ সেতুবন্ধ লাই আনা॥ (মধুমালতী: স্তবক ১১)

৪. মধুমালতী—স্তবক ৩১।

৫. ঐ—২২।

৬. ঐ—৩৪।

৭. মনঝন কৃত মধুমালতী: ভূমিকাংশ, পৃ: ১৬।

৮. একমাত্র একডলা জিলা ফতেপুরের পুঁথিটি অবলম্বন করে ডক্টর শিবগোপাল মিশ্র হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, বারানসী থেকে মধুমালতীর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। (মনঝন কৃত মধুমালতী, ভূমিকাংশ—পৃ: ২৮; 'কবীর ঔর জায়সী কা মূল্যাঙ্কন'; পুরুষোত্তম চন্দ্র বাজপেয়ী, হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, বারানসী, পৃঃ ৫৭)। রামচন্দ্র শুক্লও একটি মাত্র খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বন করে তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে মধুমালতী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন (পৃ: ৯৬)। তাঁর অবলম্বিত পুঁথির শেষাংশ ছিলোনা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন (পৃ: ৯৯)। অবলম্বিত পুঁথি ছিলো ফার্সী হরফে লিপিবদ্ধ (বাজপেয়ী, পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭)। এসব প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় শুক্লর অবলম্বিত পাণ্ডুলিপি ছিলো ভারত কলাভবনে রক্ষিত আদি-মধ্য-অন্ত্যে খণ্ডিত ফার্সী হরফের পাণ্ডুলিপি।

৯. প্রথম থেকে ২৩ স্তবক পর্যন্ত।

১০. স্তবক ২৪।

১১. স্তবক ২৫।

১২. স্তবক ৬৮।

১৩. স্তবক ৯৯।

১৪. স্তবক ১২৮।

১৫. স্তবক ১৩০।

১৬. স্তবক ৩৩১।

১৭. স্তবক ২৮।

১৮. ''জেহি জিঅ পরৈ পেম কৈ রেখা।
জহঁ দেখৈ তহঁ দেখ অদেখা॥
উপজি আব হিঅ" জো পুনি গয়ানা।
জহঁ দেখৈ তহঁ আপু অপানা॥
পুনি জো গয়ান বিরিখ ফর দেঈ।
সরবস দৈ দোসর নহিঁ লেঈ॥
কতহু" সিষ্টি মহঁ রহৈ ন দন্দু।
জহঁ দেখহি তহঁ আদি অনন্দু॥
তুই" দীপক তেহি সিষ্টি কে গেহা।
কবুহঁ জীউ জনি জানসি দেহা॥
দুখ সুখ সভ সয়ংসার কর জেত ভাবৈ তেত হোউ।
সো সভ পরসৈ আই তোহি দোসর ঔর ন কোউ॥

১৯. মনঝান কৃত মধুমালতীর ভূমিকাংশ (পৃঃ ২২)॥

২০. স্তবক ১১৩।

২১. কুতবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন রামচন্দ্র শুক্ল তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে (পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪—৯৫)। পুরুষোত্তম চন্দ্র বাজপেয়ী তাঁর 'কবীর ঔর জায়সী কা মূল্যাঙ্কন' গ্রন্থে কুতবনের কাব্য 'মৃগাবতী' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন (পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭)।

২২. মালিক মুহম্মদ জায়সীর জীবন সম্পর্কে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি 'বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা'—ষষ্ঠ বর্ষ — দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ — আশ্বিন, ১৩৬৯ সংখ্যায়।

২৩. স্তবক ৫২৮।

২৪. মধুমালতী — সম্পাদক আহমদ শরীফ : বাঙ্‌লা একাডেমী, ১৩৬৬ (পৃঃ ক)।

২৫. মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত (ঐ — পৃঃ গ)।

২৬, ভণিতা দুইটি এই :

(১) মুহম্মদ কবীরে কহে মন কুতূহলি।
আছিল ফার্সী ছন্দ রচিল পাঞ্চালি।
(২) মুহম্মদ কবীরে কহে মন কুতূহলি।
আছিল ফার্সী কিতাব করিল হিন্দুয়ালি॥

২৭. প্রতিবর্ণীকরণের জন্য যে সমস্ত পাঠবিকৃতি ঘটেছে তা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন ডক্টর মাতাপ্রসাদগুপ্ত তাঁর গ্রন্থের 'প্রতিয়োঁ কী লিপি পরম্পরা' অধ্যায়ে (পৃঃ ২৮—৩২)।

২৮. ঐ।

২৯. আদি হিন্দী কবি চন্দ বরদাঈ তাঁর 'পৃথ্বিরাজ রাসৌ' মহাকাব্যে 'পদ্মাবতী সময়' সর্গে একটি উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন, যেটাকে পদ্মাবতী কাহিনীর আদিরূপ বলতে পারি।

৩০. মুহম্মদ কবীরের পাণ্ডুলিপিতে রচনাকাল সম্পর্কে কোনো কথা নেই। ডক্টর এনামুল হক কোথাও কোনো গ্রামে একটি পুঁথি দেখেছিলেন এবং সে পুঁথির শেষ অংশটুকু নকল করে এনেছিলেন, যেখানে কাব্যরচনার সময় বলা আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এটাকে কোনো যুক্তিযুক্ত প্রমাণ বলা চলে না। যেখানে রচনাকালের স্পষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না, সেখানে আকস্মিকভাবে কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গৃহ থেকে একটি পুঁথি আবিষ্কার এবং তা থেকে কয়েকটি চরণ নকল করে আনার পর পুঁথিটির অন্তর্ধান অবিশ্বাস্য ব্যাপার (মুঃ কবীরের মধুমালতী, পূর্বোক্ত — পৃঃ চ, ছ)।

৩১. মধুমালতীর কাহিনী .... ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার (সাহিত্যপত্রিকা—৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা : পৃঃ ১০৩—১২৬)।

৩২. ফার্সী উদ্ধৃতিটি ডক্টর তরফদারের প্রবন্ধ থেকেই নেয়া।

৩৩. সৈয়দ হামজার 'প্রেমাবতী মনোহর কাব্য-'এর জন্য আমার অবলম্বন ছিলো ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি (C 3. B. 21)।

৩৪. মালতী লইয়া সুখে (মুদ্রিত পুঁথির পাঠান্তর)।

৩৫. উপনীত (ঐ)।

৩৬. ক্রোধযুক্ত দেখে কহে।

৩৭. হইও।

৩৮. সেইমাত্র এসে হেথা দিলে সমাচার।

৩৯. ক্রোধ ভাবে।

৪০. যেখানে বাগানে ছিল।

৪১. পাণ্ডুলিপিতে একটি চরণ অনুপস্থিত। মুদ্রিত পুঁথিতে আছে 'দেখিয়া সুন্দরী পেমা হইল লজ্জিত'।

৪২. মালতী শুইয়া।

৪৩. ঘৃতে যে অনল জ্বলে।

৪৪, ক্রোধভাবে।

৪৫. হইয়া।

৪৬. কোথা হইতে নাগরেরে।

৪৭. কুমারী কন্যারে মোর।

৪৮. মনঝন কৃত মধুমালতী : স্তবক ৩৩৪—৩৩৯।

৪৯. বসাইল (মুদ্রিত পুঁথির পাঠান্তর)।

৫০. শীঘ্র গিয়া।

৫১. গান।

৫২. অতি সরু গামছাতে।

৫৩. মোছন।

৫৪. নাওয়াইয়া।

৫৫. বসাইল।

৫৬. সবে অতি কুতূহলি।

৫৭. মুদ্রিত পুঁথিতে আছে 'ক্ষণমধ্যে', পাণ্ডুলিপিতে আছে 'ক্ষীণমাজা'। উভয় পাঠ মিলিয়ে সংশোধিত পাঠ নির্মাণ করা হলো, 'ক্ষীণমধ্যা'।

৫৮. এয়োরাও অন্যে যত।

৫৯, মনঝন কৃত মধুমালতী : স্তবক ৪৪৩—৪৪৬।